নীলরতন ধর

আমাদের খাদ্য

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা ২

আমাদের খাদ্য

শ্রীনীলরতন ধর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্
৯২ আপার সার্‌কুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশ ৩০ চৈত্র, ১৩৫৫

প্রকাশক ডক্টর শ্রীসুবোধনাথ বাগচী
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্
৯২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

'যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না তাহা বলিতে পারি না।… বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না; ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।'

—বঙ্কিমচন্দ্র

'যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন? সমাজে তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কতটুকু হইবে?…দেশটাকে

বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতেই হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়।…অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।'

—**বঙ্কিমচন্দ্র**

'বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ যে ভাষায় আপনাদের মধ্যে কথা কহিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা নিজেরাই বোঝেন, জনসাধারণের তাহা বোধ্য নহে।… তাঁহাদের সাধনাক্ষেত্রে দীক্ষিত ভিন্ন অন্যের প্রবেশ নিষেধ। … সাধনা-মন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায়

অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে ঊর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী।···আমাদের বাঙলা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।'

—**রামেন্দ্রসুন্দর**

'প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের রহস্য কেবলই অবারিত করছে। সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হোলো তারা

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের ছাত্র আমার পরম-স্নেহভাজন শ্রীমান্ সুবিমল ঘোষ, বি, এস-সি (অনার্স) আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমি সানন্দে সে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

গ্রন্থকার

আমাদের খাদ্য

ফরাসী বিপ্লবের সময় মানবের ইতিহাসে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষিত হইয়াছিল। নিশ্চয়ই তাহার বহু পূর্বেও অনেক দেশে চিন্তাশীল মনীষিগণ সাম্যের নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। তবে, ফরাসী বিপ্লবের সময়েই প্রথম এই বাণী ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত এবং প্রতিগৃহীত হইয়াছিল। এই বাণীগুলি মানবের ইতিহাসে ও সাধারণ মানবের জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

এই বিপ্লবের সময় একজন ফরাসী মনীষী—আন্তোয়ান ল্যাভোসিয়েঁ (১৭৪৩-১৭৯৪) তাঁহার নাম—নীরবে রসায়নাগারে তাঁহার গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানে এক নবযুগ আনয়ন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন যে, জীবন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তিনি দেখাইলেন যে, বাতাসে যে অক্সিজেন আছে, দহনের জন্য তাহা প্রয়োজন হয় এবং দহন হইতেই শক্তি উৎপন্ন হয়। কাঠ, কয়লা, তেল, পেট্রোল ইত্যাদি বাতাসের অক্সিজেনের সংগে সংযুক্ত হইয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করে এবং তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। যত যুদ্ধ-বিগ্রহ— সবই এই শক্তিমান পদার্থের অধিকার লইয়া। এই যে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের লীলাখেলা চলিতেছে, তাহাও পেট্রোলের জন্যই। পেট্রোল অক্সিজেনের সংগে সংযুক্ত হইলে প্রভূত শক্তি উৎপাদিত হয়।

যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য—ইহাদের প্রত্যেকটিতেই কার্বন-সংযুক্ত পদার্থ আছে। ভোজনের পরে দেহাভ্যন্তরে যাইয়া নিঃশ্বসিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহারা দগ্ধ হয় এবং জীবদেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। এই তাপ ও শক্তির সাহায্যে জীবনধারণ সম্ভব হয়। কয়লা, তেল, কাঠ, পেট্রোল দগ্ধ হইয়া যেমন উত্তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়, জীবদেহে খাদ্যগুলিও সেইরকম আস্তে আস্তে দগ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চার করে।

মানুষ যাহা খায়, তাহা নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate), স্নেহ পদার্থ (fat), প্রোটীন বা আমিষ জাতীয় দ্রব্য (protein), জল, ধাতব দ্রব্য (mineral salts) ও খাদ্যপ্রাণ (vitamin)।

কার্বোহাইড্রেট—যেমন চিনি, গ্লুকোজ, আলু, চাল, গম, ভুট্টা, রাগি, মিঠে-আলু, টাপিয়োকা। এইসব জিনিসকে কার্বোহাইড্রেট বলা হয়, কারণ ইহা হইতে কার্বন সহজেই পাওয়া যায় এবং এই কার্বন দগ্ধ হইয়া শক্তি উৎপাদন করে। এইসব পদার্থে ঘন (concentrated) সালফিউরিক অম্ল (sulphuric acid) দিলে উহা জল টানিয়া লইয়া কার্বন সৃষ্টি করে—অর্থাৎ এই দ্রব্যগুলি জল ও কার্বনের সমষ্টি। চাল, ডাল, গম প্রভৃতি খাদ্যে জলের ভাগ কম, এবং সেইজন্য উহা অল্প পরিমাণে খাইলেও দগ্ধ হইয়া যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি হয়। সর্বত্রই মানবজাতি উত্তাপ ও শক্তির জন্য এই দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিয়া থাকে। পৃথিবীর

অধিকাংশ লোকই চাল খাইয়া জীবনধারণ করেন। ভারত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, মালয় ও অন্যান্য সুদূর প্রাচ্য দেশের অধিবাসীরা চালের উপরেই শক্তির জন্য নির্ভরশীল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে চালের দাম কম থাকায় অতি অল্প খরচেই পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীর স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হইত। ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে গমের ব্যবহার প্রচলিত। এই সকল দেশের অধিবাসীরা খাদ্যের জন্য প্রাচ্য জাতি অপেক্ষা খরচ বেশী করিয়া থাকেন। ইটালীতে আগে ভুট্টার চাষ বেশী হইত এবং সে দেশবাসীরা ভুট্টা হইতে ম্যাকারনি (macaroni) প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতেন। বস্তুত এই ম্যাকারনিই ইটালীয়দের প্রধান খাদ্য ছিল। মুসোলিনী তাঁহার দেশবাসীকে সভ্য করিবার জন্য গম উৎপাদন করিয়া পাঁউরুটি খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের আধিভৌতিক (Psychical) গবেষণার নেতা বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুকশ্ ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, ইউরোপীয় জাতিরা যদি অবহিত না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনাহারে মরিতে হইবে এবং চীন, জাপান ও অন্যান্য এসিয় জাতিরা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, গম উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ জমিতে দেওয়া দরকার, ধান, বজরা, রাগি, ভুট্টা উৎপাদনে অত নাইট্রোজেন-সংযুক্ত পদার্থের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত

নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ চিলি হইতে ইউরোপে যাইত। স্বাভাবিক অবস্থায় চিলিতে সোডিয়াম নাইট্রেট্ বা চিলি সল্ট পিটার (salt petre) খনিজ রূপে পাওয়া যাইত। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মত ইহাও ধীরে-ধীরে ব্যবহৃত হইয়া খরচ হইতেছে এবং সত্বরই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। ক্রুকশ্ বলেন যে, কলকারখানায় নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ প্রস্তুত করিতে না পারিলে ফসল-উৎপাদন, বিশেষত গম-উৎপাদন করা কঠিন হইবে এবং সভ্য জাতিরা, বিশেষত ইউরোপীয় ও আমেরিকানরা, আর গম খাইতে না পাইয়া ক্রমশ ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। ভারত এবং চীন, জাপান, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশের তথাকথিত পীত জাতিরা কিন্তু গম না খাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিতেছে এবং বাড়িতেছেও। ক্রুকশের এই ঘোষণার পরে জার্মান বিজ্ঞানীরা, বিশেষত অধ্যাপক হাবার (Haber) ও অধ্যাপক বশ্ অনেক বৎসর ধরিয়া গবেষণা করিয়া কৃত্রিম নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন। আজকাল পৃথিবীর সকল সভ্য জাতি কৃত্রিম নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এবং এই শিল্প আজকাল কয়লা বা লৌহ-শিল্পের ন্যায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও এই শিল্পের তেমন উন্নতি বা প্রসার হয় নাই।

গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে বহুলভাবে গম-উৎপাদন করিবার চেষ্টা হয় এবং অনেক জমিতে কৃত্রিম সারের সাহায্যে সরকারী

অর্থানুকূল্যে গম উৎপাদিতও হইয়াছিল। এই কারণেই যুদ্ধের সময় ইংরাজ জাতির রুটি পাইবার তেমন কষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষেও খাদ্য-শস্যের বহুল উৎপাদন করিতে হইলে গোময় ও অন্যান্য জৈব সারের সহিত কৃত্রিম সারের ব্যবহার অপরিহার্য। দেশে কৃত্রিম সার প্রস্তুত করিতে না পারিলে দেশের কৃষকরা তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে না, কারণ বিদেশী কৃত্রিম সার অতিশয় দুর্মূল্য। সকল দেশেই যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, চাল বা ভুট্টাই তাহাদের প্রধান খাদ্য। এইসব ফসল-উৎপাদনে নাইট্রোজেনযুক্ত সারের বিশেষ উপকারিতা লক্ষিত হইয়াছে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে মানবজাতি জন্মহার কমাইতে চেষ্টিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত গম, চাল, ভুট্টা প্রভৃতি ফসল-উৎপাদনের হার বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন জৈব ও অজৈব সারের। এই সার ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে উৎপাদন করিতেই হইবে।

প্রোটীন (অর্থাৎ নাইট্রোজেনযুক্ত আমিষ পদার্থ)— ইহা দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদিতে থাকে। মাছ ও মাংসে ১৮-২০% ; ডিমের সাদা ভাগে ১২% ; ডিমের পীত অংশে ১৬% ; যকৃৎ-এ ২৯% ; বৃক্কতে (kidney) ২৬% ; পনিরে ১০-৪০% ; দুধে ৩-৪% ; গমে ১০-১৩% ; চালে ৭% ; আলুতে ২% ; মটর ও কড়াইশুঁটিতে ৬-২০% ; শাক-সবজিতে ১-২½% প্রোটীন পাওয়া যায়। যত জৈব পদার্থ আছে, কম-বেশী প্রোটীন তাহাতে

থাকিবেই। প্রোটীন-বিহনে জৈব পদার্থ সৃষ্ট হয় না; তবে মাছ, মাংস, ডিম, পনির ও ডাল জাতীয় পদার্থেই প্রোটীনের ভাগ অধিক। সাধারণত মানুষ যাহা খায়, তাহার মধ্যে ১০-১৫ ভাগ প্রোটীন জাতীয় পদার্থ থাকে। তবে, যাঁহাদের অবস্থা ভালো, তাঁহারা ৩০% পর্যন্ত প্রোটীন খাইয়া থাকেন। জান্তব প্রোটীন খাইতেই অধিকাংশ মানুষের প্রবল আকাংখা। জান্তব প্রোটীন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ হইতে পাওয়া যায়। তবে, দুধের অসুবিধা এই যে, ইহাতে প্রায় ৮৮ ভাগ জল বর্তমান; সুতরাং ইহার প্রোটীন ব্যবহার করিতে হইলে অনেকটা দুধ খাওয়া দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন ইউরোপে খাদ্য-দ্রব্যের অনটন ছিল না, তখন অধিকাংশ ইউরোপীয় প্রচুর জান্তব প্রোটীন খাইতেন। উদ্ভিজ্জ প্রোটীন অপেক্ষা এই প্রোটীনের মূল্য বেশী। গত বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বলেন যে, আমাদের (অর্থাৎ ইংরাজদের) এখন জান্তব প্রোটীনের অভাবে নিরামিষাশী হইতে হইবে। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় গত বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল, যদিও তখন খাদ্যে জান্তব প্রোটীনের ভাগ অনেক কমিয়া গিয়াছিল এবং উহা একঘেয়েমির দোষ-মুক্ত ছিল না।

গরীব জাতিরা প্রধানত উদ্ভিজ্জ প্রোটীন খাইয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা সাধারণত ৫০ ভাগ জান্তব ও ৫০ ভাগ উদ্ভিজ্জ প্রোটীন খান, অথচ

দারিদ্র্যের জন্য চীন, জাপান, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের খাদ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ১০-১৫ ভাগের অধিক জান্তব প্রোটীন থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রোটীন ভাংগিয়া এমিনো-অম্ল হয়। এই এমিনো-অম্লগুলিতে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং অধিকাংশতে গন্ধক (sulphur) ও ফস্‌ফরাস থাকে। এমিনো-অম্লগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক ভাগ লাইসিন, লিউসিন, থ্রিয়োনিন, ফেনিল-এলানিন ইত্যাদি। ইহারা খাদ্যে না থাকিলে মানবের দেহ-তন্তু (tissue) বর্ধিত হইতে পারে না এবং নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। অন্য এমিনো-অম্লগুলি, যেমন গ্লাইসিন, এলানিন, সিট্রোলিন ইত্যাদি না খাইলেও শরীরের ক্ষতি হয় না। সেইজন্য প্রথমোক্ত এমিনো-অম্লগুলিকে আবশ্যকীয় এমিনো-অম্ল বা essential amino acid আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে এই আবশ্যকীয় এমিনো-অম্লের ভাগ অধিক (তালিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া জীবনসংগ্রামে কৃতকার্য হইতে হইলে আবশ্যকীয় এমিনো-অম্লজাত পদার্থ আহার অবশ্য কর্তব্য। যেসব জাতি আমিষ অর্থাৎ আবশ্যকীয় এমিনো-অম্লযুক্ত পদার্থ প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেন, পৃথিবীতে তাঁহারাই অগ্রণী।

ডাল, ভাত, রুটিতেও আবশ্যকীয় এমিনো-অম্ল আছে, কিন্তু কম পরিমাণে (তালিকা দ্রষ্টব্য)। আবার গমে

যদিও চাল অপেক্ষা প্রোটীনের ভাগ অধিক, চালের প্রোটীনে আবশ্যকীয় এমিনো-অম্লের ভাগ অধিক। ভারতের অধিকাংশ লোক চাল খাইয়া জীবনধারণ করেন। চালের সুবিধা হইতেছে যে, উহাতে আবশ্যকীয় এমিনো-অম্লের ভাগ অধিক; কিন্তু অসুবিধা এই যে, উহাতে প্রোটীন ও খাদ্যপ্রাণের ভাগ কম। আবার গমে মোট প্রোটীন বেশী এবং খাদ্যপ্রাণ 'বি' অনেক বেশী। খাদ্যপ্রাণ 'বি'-র অভাবে বেরিবেরি হয়। বাঙালীরা সাধারণত কলছাঁটা পরিষ্কার চাল খাইয়া থাকেন। ইহাতে গমে যেমন খাদ্যপ্রাণ 'বি' আছে, তাহা নাই। এরূপ চাল খাওয়ায় অনেক সময় দেখা যায় বেরিবেরি রোগ হইতেছে। এই রোগের প্রথম দিকে পা ফুলিতে থাকে এবং সাবধান না হইলে ক্রমে-ক্রমে হৃৎপিণ্ড, চক্ষু, স্নায়ু ইত্যাদি আক্রান্ত হয়। এই রোগে খাদ্যপ্রাণ 'বি' খাওয়াইলে রোগমুক্ত হওয়া যায়। গমে খাদ্যপ্রাণ 'বি' আছে, সুতরাং ভাত বন্ধ করিয়া রুটি খাইলে বেরিবেরি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কলের সরিষার তেল খাইলে বেরিবেরি জাতীয় রোগ (epidemic dropsy) হয়। আরও দেখা গিয়াছে যে, কালো শস্তের সহিত শেয়াল-কাঁটার বীজ মিশাইয়া যে তেল উৎপন্ন হয়, তাহা বিষাক্ত এবং ঐ তেল ব্যবহারে বেরিবেরির সৃষ্টি হয়।

চালে আবশ্যকীয় এমিনো-অম্ল থাকার দরুণ চাল খাইলে বুদ্ধিবৃত্তি হয়তো বাড়িতে পারে, তবে দেহের পুষ্টি

ও শক্তির জন্য গম খাওয়া প্রয়োজন এবং সেইজন্য অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খাওয়া প্রকৃষ্ট। ভারতবর্ষে কাশ্মীরীরা (নেহেরু, সাপ্রু, কুন্‌জ্‌রু, কাট্‌জুরা সব কাশ্মীরী পণ্ডিত) সাধারণত অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খাইয়া থাকেন। সেইরকম গান্ধীজীর দেশবাসীরা অর্থাৎ গুজরাটীরা, অথবা তিলকের দেশবাসীরা অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়রা অর্ধেক গম এবং অর্ধেক চাল আহার করিয়া থাকেন। হয়তো এই কারণেই বর্তমানে ভারতবর্ষে ইহারা কর্মজীবনে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাদ, মালয়ালম প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীরা কেবলমাত্র চাল বা রাগি খাইয়া থাকেন। গম ব্যবহারে ইহারা অনিচ্ছুক। যখন দেশে লোকসংখ্যা কম ছিল, খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যাইত এবং দেশ শস্যশ্যামলা ছিল, তখন বাংলা ও আসামে মাছ ও দুধের সুপ্রাচুর্য ছিল। তখন গম হইতে প্রোটীন ও খাদ্য-প্রাণ না গ্রহণ করিয়াও মাছ, দুধ, তরকারি হইতেই এইসব আবশ্যকীয় পদার্থ পাওয়া যাইত। অন্ধ্র, তামিলনাদ ও মালয়ালমের অব্রাহ্মণরা সমুদ্রজাত মৎস্য খাইতেন এবং এখনও খাইয়া থাকেন। অন্ধ্র ও তামিলনাদের ব্রাহ্মণরা ঘি, দুধ, দৈ এবং ডাল প্রচুর পরিমাণে খাইতেন এবং সেইজন্য চাল খাইলেও তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি হইত না। আজকাল সকল খাদ্যদ্রব্য শতকরা ৪০০ গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে এবং অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দুধ, দৈ, ঘি, ছানা ইত্যাদি খাওয়াই অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।

এইজন্য এখন খাদ্যসমস্যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং আমূল খাদ্য-সংস্কারে যত্নবান হইতে হইবে। মুখরোচক বা পুরুষানুক্রমে এতদিন যাহা খাওয়া হইয়াছে, তাহা খাইলেই চলিবে না। বাঙালী, আসামী ও অন্যান্য যাঁহারা এতদিন ভাত খাইয়াই বাঁচিয়াছেন, তাঁহাদের গুজরাটী, মারাঠী, কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মত অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খাইতে হইবে। রাগি মাদ্রাজে ও মহীশূরে খুব উৎপন্ন হয় এবং জনসাধারণ ইহা খাইয়া থাকেন। ইহার সহিত ডাল, তরকারি এবং দুধ বা মাছ খাওয়া অবশ্য কর্তব্য। মালয়ালীরা টাপিয়োকা খাইয়া থাকেন। খাদ্য হিসাবে ইহা সস্তা এবং শক্তি-উৎপাদনের দিক হইতেও ইহা ভালো; কিন্তু ইহাতে প্রোটীনের ভাগ চাল অপেক্ষাও কম। সেইজন্য ইহার সহিত মাছ, মাংস, ডিম, অন্তত ডাল খাওয়া দরকার। আশ্চর্যের বিষয় মালয়ালমে ডালের প্রচলন কম। সাধারণত ব্রাহ্মণরাই ওদেশে ডাল খান, অথচ জনসংখ্যায় অব্রাহ্মণরাই বেশী এবং তাঁহারা ডাল কম খান। যখন মাছ সহজপ্রাপ্য ও সস্তা ছিল, তখন মাছ হইতে আবশ্যকীয় এমিনো-অম্ল তাঁহারা পাইতেন। এখন মাছ দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হওয়াতে সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। তাই ডালের প্রচলন সরকারের করা উচিত।

খাদ্য হিসাবে প্রাচ্যে ডালের প্রচুর প্রচলন আছে। তাহার কারণ এই যে, ডালে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটীন দুই-ই থাকে। ডালে জলের ভাগ কম। ভারতবর্ষের প্রায়

সর্বত্রই ডাল ব্যবহৃত হয় এবং অধিকাংশ ভারতবাসীই তাঁহাদের প্রোটীন ডাল হইতে পান। বহুকাল আগে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের দেহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ম্যাকে সাহেব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগীদের উপর ডালের কার্যকারিতা বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ডালের প্রোটীনের অধিকাংশ কোনো কাজে লাগে না এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় মলের সহিত নিষ্কাশিত হয়। অথচ, ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ডাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাত-ডাল, ডাল-রুটি ভারতীয়ের প্রধান খাদ্য। বুঁদে, মিহিদানা, লাড্ডু প্রভৃতিতেও অধিকাংশ ভাগ ডাল এবং এইসব জিনিস কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই প্রচুর ব্যবহৃত হয়। যত প্রকার ডাল আছে, তাহার উপকারিতা ও শরীরপোষণ ক্ষমতা সম্বন্ধে ভারতীয় দেহ-বিজ্ঞানীদের প্রচুর গবেষণা করা কর্তব্য। ইউরোপ ও আমেরিকায়, বিশেষত চীন ও জাপানে, সোয়াবিন জাতীয় ডালের খুব ব্যবহার আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন এখনও আরম্ভ হয় নাই। সোয়াবিনে প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ-জাতীয় পদার্থ বর্তমান। ইহা প্রচুর পরিমাণে চাষ করিতে পারিলে অন্যান্য ডালের সমমূল্যে বিক্রয় হইতে পারে ও খাদ্যরূপে চালু হইতে পারে। তবে, ডালের প্রোটীনে দুধ, মাছ, মাংস বা ডিমের প্রোটীনের মত আবশ্যকীয় এমিনো-অম্ল থাকে না। সুতরাং ডাল খাইলেও দুধ বা মাছ-মাংস খাওয়া দরকার।

কতটা আমিষ পদার্থ খাওয়া দরকার—দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সর্বত্রই ধনীরা প্রচুর ভোজন করিয়া থাকেন এবং সাধারণত দেহ-বিজ্ঞানের নিয়ম মানেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ইউরোপীয় ধনীরা সাধারণত মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খাইতেন এবং ৩০০০ কিলো-ক্যালোরী-উৎপাদক খাদ্যের মধ্যে অন্তত ১৫০০ কিলো-ক্যালোরী মাছ, মাংস, ডিম হইতে গ্রহণ করিতেন। অর্থাৎ তাঁহারা দিনে ৩০০-৪০০ গ্রাম আমিষ পদার্থ আহার করিতেন। সাধারণ লোকের খাদ্য-মান নির্ধারণের জন্য বড়ো বড়ো সহরের খাদ্য-ক্রয়-বিক্রয় তালিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মিউনিক প্রভৃতি সহরের অধিবাসীরা অন্ততঃ ১০০-১৫০ গ্রাম প্রোটীন প্রত্যহ খাইতেন। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন ফয়িট (Voit) বলেন যে, মানুষের প্রত্যহ ১১৮ গ্রাম প্রোটীন খাওয়া উচিত। প্রথম যুদ্ধের সময় জার্মানরা ডুবোজাহাজের সাহায্যে জাহাজ ডুবাইতে আরম্ভ করায় যখন খাদ্য-সরবরাহ কঠিন হইল, তখন ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি নিয়ম করিয়া দিলেন যে, দেশবাসীরা যেন ১০০ গ্রামের অধিক প্রোটীন না খান। ক্রমে-ক্রমে যখন ডুবোজাহাজের দৌরাত্ম্য আরও তীব্র হইল এবং জাহাজ বেশীর ভাগই ডুবিতে লাগিল, তখন ১০০ গ্রাম হইতে কমাইয়া ৭৫ ও পরে ৬০ গ্রাম প্রোটীনের নির্দেশ হইল।

১৯০৮ সাল হইতে প্রসিদ্ধ মার্কিন বিজ্ঞানী চিটেন্‌ডেন এই প্রোটীন খাওয়ার হারের বিষয়ে অনেক গবেষণা করেন।

প্রথমে তিনি তাঁহার নিজের উপর, পরে তাঁহার ছাত্রদের উপর এবং মার্কিনী সৈন্যদের উপর পরীক্ষা চালান। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, ফয়িটের মতানুযায়ী ১১৮ গ্রাম প্রোটীন খাওয়া ভুল। দৈনিক ৩০ গ্রাম প্রোটীন খাইলেই যথেষ্ট হয়। এই অল্প পরিমাণ প্রোটীন খাইলেও কর্মকুশলতা ও শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। তিনি বলিয়াছেন যে, ৩০ গ্রাম প্রোটীন খাইয়া তাঁহার দেহের ওজন কিছু কমিয়াছিল বটে, কিন্তু ১১৮ গ্রাম প্রোটীন খাইবার সময় যত ঘন-ঘন সর্দি-কাশি হইত, ৩০ গ্রাম প্রোটীন খাইয়া তাহা ঢের কমিয়া গেল। তিনি বিশেষভাবে প্রচার করেন যে, মানুষের সুস্থ থাকিতে হইলে ৩০ গ্রামের অধিক প্রোটীন খাওয়া অনুচিত। প্রোটীনের দাম অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা বেশী বলিয়া অধ্যাপক চিটেন্‌ডেনের মতানুযায়ী চলিলে অর্থক্লিষ্ট মানবজাতি অনেক বাজে খরচ হইতে রেহাই পাইতে পারেন।

কোপেনহেগেনের ডাক্তার হিণ্ড্‌হেডা (Hindhede) এই প্রোটীন সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার পুত্র-কন্যারা খুব কম পরিমাণ প্রোটীন খাইয়াও সুস্থভাবে জীবনধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধ আলু, পাঁউরুটি, কৃত্রিম মাখন, এক-আধখানা আপেল ও সামান্য দুধ খাইয়া বছরের পর বছর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারাও বলেন যে, ১১৮ গ্রাম প্রোটীন বা মাছ, মাংস, ডিম খাইবার কোনোই প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের নিত্যকার আহার্যে খুব বেশী প্রোটীন থাকিত না, অথচ তাঁহারা বেশ সুস্থ ছিলেন।

সুইডিস্ বিজ্ঞানী শিভেনও খাদ্য লইয়া অনেক গবেষণা করেন এবং বলেন যে, প্রত্যহ ১৫ গ্রাম প্রোটীন খাইলেই যথেষ্ট।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রোটীন-আহারের পরিমাণ লইয়া বহু মতভেদ আছে। তবে আমাদের মতে প্রত্যহ প্রায় ১০০ গ্রাম প্রোটীন খাওয়াই উচিত। এই ১০০ গ্রাম কেবল উদ্ভিজ্জ হইলে চলিবে না, কারণ উদ্ভিজ্জ প্রোটীনে আবশ্যকীয় এমিনো-অম্ল যথেষ্ট পাওয়া যায় না। অন্ততঃ ৩০ গ্রাম জান্তব প্রোটীন দুধ, মাছ, মাংস, ডিম হইতে এবং অপর ৭০ গ্রাম ডাল বা অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে লওয়া চলিতে পারে। খানিকটা জান্তব প্রোটীন খাওয়া কিন্তু অত্যাবশ্যক। গত বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ৭০ গ্রাম—তাহার মধ্যে ২৪ গ্রাম জান্তব—প্রোটীন প্রত্যহ নির্দেশ করিয়াছিলেন।

স্নেহজাতীয় পদার্থ—তেল, ঘি, মাখন প্রভৃতি যুগ-যুগান্তর হইতে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষে তেল-উৎপাদক শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তর ভারতে সাধারণ লোকে সরিষার তেল ব্যবহার করেন। দক্ষিণাপথে বাদামের তেল, তিলের তেল ও নারিকেলের তেল ব্যবহৃত হয়। তেলের দাম কম বলিয়া সব দেশেই অল্পবিত্ত ব্যক্তিরা বেশীর ভাগ তেল ব্যবহার করেন। ধনীরা জান্তব স্নেহজাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ মাখন, ঘি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউরোপের ইটালী ও অন্যান্য দেশে জলপাইয়ের তেল খুব ব্যবহৃত হয়, তবে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ মাখনই ব্যবহার করেন।

ইউরোপে রন্ধনের জন্য চর্বি (lard) অর্থাৎ মাংস গরম করিয়া যে স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহা প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে জার্মানী যখন গরীব হইয়া গিয়াছিল, জার্মানরা তখন মাখনের পরিবর্তে রুটিতে লার্ড মাখাইয়া খাইতেন। কারণ, জান্তব স্নেহপদার্থ উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। জান্তব স্নেহ-পদার্থে সাধারণত খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও 'ডি' অধিক পরিমাণে থাকে।

১৯১২ সনে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী অধ্যাপক পল সাবাতিয়েঁ দেখান যে, বিচূর্ণ নিকেল ধাতু ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে তৈলাক্ত পদার্থকে সহজেই মাখনের মত পদার্থে পরিণত করা যায়। এবিষয়ে অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা হইয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই এই প্রণালীতে কৃত্রিম মাখন তৈরী হইতেছে। এই প্রকার কৃত্রিম মাখনকে মার্গারিন (margarine) বলা হয়। চূর্ণীকৃত নিকেল খুব সহজেই মাখন হইতে দূরীভূত করা যায়। কৃত্রিম মাখন গলাইলে নিকেল-চূর্ণ পাত্রের তলদেশে থিতাইয়া (জমিয়া) যায় এবং উপর হইতে গলা মাখন অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইলে সেই মাখনে আর নিকেল ধাতু থাকে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, খুব অল্প পরিমাণ নিকেল ধাতু খাইলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। এমন কি বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী গ্যাবরিয়েল বার্ত্রা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানব-দেহের রক্তে, পেশী ও অন্যান্য যন্ত্রে খুব অল্প পরিমাণ নিকেল স্বভাবত বিদ্যমান।

এই ধাতু উদ্ভিদ হইতে জীবরা সংগ্রহ করে এবং উদ্ভিদ তাহা পাইয়া থাকে জমি হইতে।

গত যুদ্ধের সময় অধ্যাপক ডুয়েল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ কৃত্রিম মাখন লইয়া অনেক গবেষণা করেন। তাঁহারা দেখান যে, যদি তেলে বা হাইড্রোজেন গ্যাসে কোনো বিষাক্ত পদার্থ না থাকে, তাহা হইলে যে-কৃত্রিম মাখন প্রস্তুত হয়, তাহা অনায়াসে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই কৃত্রিম মাখনে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও 'ডি' মিশ্রিত করিয়া দিলে তাহা স্বাভাবিক মাখনের মতই কার্যকরী হয়। ভারতবর্ষে এইরূপ কৃত্রিম ঘি ও মাখনের অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রচুর ঘি-মাখন প্রস্তুত হইতেছে। ব্যবসায়ীদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কৃত্রিম মাখন উৎপাদনের জন্য তাঁহারা যে তেল, নিকেল ধাতু ও হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করেন, তাহাতে যেন কোনো দূষণীয় পদার্থ না থাকে এবং ঐ কৃত্রিম মাখনে যেন উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও 'ডি' মিশ্রিত করা হয়।

তরি-তরকারি—আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি শাক-সবজি খাইয়া দেহধারণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে পশুপক্ষী বিনাশের প্রয়োজন কি? দরিদ্র ভারতবাসী ও চীনদেশীয়রা চিরকালই শাক-সবজি খাইতেন। সকল রকম শাকই খাওয়ার প্রচলন ছিল। প্রসিদ্ধ আমেরিকান খাদ্য-বিশারদ অধ্যাপক ম্যাক্‌কলাম বলিয়াছেন যে, শাকই ভারতীয় ও চীনদেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছে, কারণ শাকে খাদ্যপ্রাণ

'এ' থাকে। খাদ্যপ্রাণ 'এ' খাইলে রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; শাককে তাই প্রতিষেধক (protective) খাদ্য বলা হয়। শাকের আরও উপকারিতা আছে। আমরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছি যে, অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা শাকে লৌহঘটিত পদার্থ বেশী থাকে। লৌহঘটিত পদার্থ খাদ্য-পরিপাক ও দহনে সহায়তা করে এবং দেহের শোণিত বৃদ্ধি করে। রক্তের হিমোগ্লোবিনে লৌহঘটিত পদার্থ বর্তমান। রোগ-ভোগের দরুণ যখন রক্তে লৌহঘটিত পদার্থের হ্রাস হয়, তখন যকৃৎ-নির্যাস বা অন্য কোনো লৌহঘটিত ঔষধ খাওয়ানো কিংবা রক্তের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে শরীরে লৌহঘটিত পদার্থ বৃদ্ধি করার ফলে দহন ও পরিপাকক্রিয়া সহজতর হয়।

সব তরকারিই খাদ্য হিসাবে ভালো জিনিস। কারণ তরকারিতে কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও প্রোটীন পাওয়া যায় এবং উহার দহনে আমরা শক্তি লাভ করি। তরকারির আরও উপকারিতা এই যে, ইহাতে হাড়, দাঁত ইত্যাদি গঠনের সহায়ক চূণ-জাতীয় পদার্থ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ ইত্যাদির লবণ থাকে। এই সব দ্রব্য শরীর-সংগঠনে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অনায়াসেই শাক-সবজি হইতে পাওয়া যায়। সবজিতে খাদ্যপ্রাণও মিলে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শাকে খাদ্যপ্রাণ 'এ' থাকে। আলুতে খাদ্যপ্রাণ 'বি' ও 'সি' পাওয়া যায়। পাতিলেবুতে খাদ্যপ্রাণ 'সি'-র পরিমাণ অনেক বেশী। রাঙা

২

বা মিঠে-আলুকে ভারতবাসীরা তুচ্ছ করেন, অথচ আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাঙা আলু অতিশয় উত্তম ও উপকারী খাদ্য। সাধারণ আলুতে প্রায় ৭৫ ভাগ জল থাকে, আর থাকে ২০ ভাগ শ্বেতসার, ২ ভাগ প্রোটীন এবং সেলুলোজ ও লবণ জাতীয় পদার্থ। মিঠে-আলুতে ২৭ ভাগ শ্বেতসার এবং প্রায় ২ ভাগ প্রোটীন পাওয়া যায়। কিন্তু মিঠে-আলুতে খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ সাধারণ আলুর চাইতে অনেক অধিক এবং সেই জন্যই ইহা অনেক বেশী উপকারী। কলিকাতার বাজারে সাধারণ আলুর দাম সের প্রতি ॥৶০-৸০ আনা, অথচ মিঠে-আলুর দাম ৶০-।০ আনা, যদিও মিঠে-আলুতে শ্বেতসার বেশী এবং খাদ্যপ্রাণ 'এ', 'বি' ও 'সি' অনেক বেশী। এই কারণে মিঠে বা রাঙা আলুর প্রভূত প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

লাউ, মিঠে-কুমড়া, চাল-কুমড়া, শাকের ডাঁটা প্রভৃতি তরকারি হইতে শক্তিদায়ক শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ, প্রোটীন পাওয়া যায়। সর্বোপরি পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ প্রভৃতির লবণ ইহারা আমাদের সরবরাহ করে এবং সবকিছু দহনের পর ক্ষারজাতীয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। এই ক্ষার দাঁত ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রের গঠনে সহায়তা করে এবং রক্তকে অল্প পরিমাণে ক্ষারযুক্ত (alkaline) করে। মাছ, মাংস, ডিম, ভাত, রুটি খাইলে উহা দগ্ধ হইয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল সৃষ্টি করে এবং সংগে সংগে বহু অম্ল পদার্থ উদ্ভূত হয়। অথচ তরকারির ধ্বংসাবশেষ মাত্র

ক্ষারজাতীয় পদার্থ। সেইজন্য মাছ, মাংস, ডিম, রুটি, ভাত হইতে সৃষ্ট অম্ল-পদার্থকে বিনষ্ট করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ তরকারি খাওয়া অত্যাবশ্যক। তরকারি না খাইলে বা কম খাইলে দেহে-জমা অম্ল-পদার্থ দেহের যন্ত্রগুলিকে ধ্বংস করিতে থাকে এবং অগ্নিমান্দ্য ও পেটের নানারকম গোলমালের সূচনা হয়। ফলে, দেহের অভ্যন্তরে ক্ষত হইতে থাকে এবং তাহাতে প্রভূত রক্ত নির্গত হওয়ার আশঙ্কা জন্মে। এইসব ব্যাধি ভারতের সর্বত্র দেখা যায়, কারণ আমরা তরকারি কম খাই। অথচ ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, মিষ্টি প্রচুর খাইয়া থাকি। অনেক পরিবারেই তরকারির ব্যবহার খুব কম এবং সেইজন্য অনেকেই অম্ল-পদার্থ হইতে উদ্ভূত অম্বল (acidity) রোগে ভোগেন। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, ডিমের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ তরকারি খাইলে এই সকল রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ; অর্থাৎ পূর্ণোপকরণ (balanced) খাদ্যই অবশ্য গ্রহণীয়। ইউরোপীয়রা প্রভূত পরিমাণ সিদ্ধ বাঁধাকপি, আলু, গাজর, মটর ইত্যাদি মাংসের সহিত খান। গরীব জার্মানরা ও আইরিশরা তো কেবল সিদ্ধ আলু খাইয়াই জীবনধারণ করেন। আলু হইতে আমরা সহজেই ক্ষারজাতীয় পদার্থ ও শক্তি পাইতে পারি। ভাত ও রুটির ধ্বংসাবশেষ অম্ল-জাতীয় পদার্থ, তাই বেশী পরিমাণে ভাত না খাইয়া অল্প পরিমাণ ভাতের সহিত বেশ কিছুটা আলু ও তরকারি খাওয়া উচিত। এদেশে আজকাল বহুলোককে আলসার, গ্যাসট্রাইটিস বা সোজা

কথায় পেটের গোলমালে ভুগিতে দেখা যায়। এটা বেশী দেখা যায় যাঁহারা বসিয়া-বসিয়া কাজ করেন এবং তরি-তরকারি না খাইয়া মুখরোচক মাছ, মাংস, ডিম, ভাত, রুটি প্রভৃতি খান। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে সকল পদই অধিক পরিমাণ ঝাল ও মসলা সহযোগে মুখরোচক করা হয় এবং ভূরিভোজন করানো হয়। ফলে ভোক্তার দেহে অম্ল-জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং কষ্ট হয়। এই অম্ল পদার্থ নষ্ট করিতে হইলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া, খড়িমাটি (chalk), ক্যালসিয়াম ফসফেট বা অন্যান্য ক্ষার-জাতীয় পদার্থ খাওয়ার প্রয়োজন ঘটে। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের প্রায় সর্বত্রই রন্ধনে ঝাল মশলার প্রয়োগ বেশী। আমাদের জনৈক অন্ধ্রদেশীয় বন্ধু বলেন, আমাদের সকল খাদ্যই এমন ভাবে রন্ধন করিবার চেষ্টা হয় যেন তাহা আমাদের জিহ্বাকে কামড়াইতে পারে। যে খাদ্য আমাদের জিহ্বাকে না কামড়ায়, তাহা আমাদের পছন্দ হয় না। পূর্ববংগে 'বিশালচরিত কথানারায়ণ' অনেকেই জানেন। তাহাতে পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তরকারিতে কত লংকা দেওয়া হইয়াছিল। পুত্র উত্তর করিল, "আট গণ্ডা।" মুরগি বা অন্যান্য মাংসতে অধিকাংশ সময় এত প্রচুর পরিমাণে শুকনো লংকা বাটিয়া দেওয়া হয় যে, মাংসের ঝোল একেবারে লাল রং ধারণ করে। দক্ষিণ ভারতেও তেঁতুলের সহিত লংকা-বাটা বা লংকার গুঁড়া দিয়া পাতলা ঝোলের মত 'রসম' নামে খাদ্যের বহুল প্রচলন আছে। অথচ ইউরোপে অধিকাংশ

খাদ্যই মাত্র সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয় ; মশলা, নুন আলাদা থাকে, ইচ্ছামত মিশাইয়া লওয়া চলে। বদ-হজম হইতে উদ্ভূত আমাদের দেশের অনেক অসুখেরই কারণ এই অধিক পরিমাণ ঝাল, মশলা ও ঘি-তেলবহুল মুখরোচক খাদ্য। মুখরোচক খাদ্যের লোভ সংবরণ করিতে না পারিলে আমাদের পেটের গোলমালের দায় হইতে নিষ্কৃতি নাই।

পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে, পয়সাওয়ালা লোক শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ভোজন করেন। একদিন দুইদিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে বেশী খাইলে শরীরের তত ক্ষতি হয় না, তবে প্রত্যহই অধিক পরিমাণ মুখরোচক এবং গুরুপাক দ্রব্য খাইলে পরিপাকের জন্য যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয়ের কাজ অযথা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে এই দুটি যন্ত্র ক্লান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়ে। অবশেষে খাদ্য হইতে উদ্ভূত শর্করা (glucose) অগ্ন্যাশয়ের রস ইনসুলিন দ্বারা আর জীর্ণ হইতে পারে না। একজন লোকের দেহে সাধারণত ⁄৫ সের আন্দাজ রক্ত থাকে। রক্তে যখন ৫ গ্রামের বেশী গ্লুকোজ থাকিয়া যায়, তখনই উহা রক্ত হইতে প্রস্রাবে নির্গত হয় এবং বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি করে। যখন অগ্ন্যাশয় একেবারেই কার্যকরী থাকে না, তখন খাদ্য হইতে প্রস্তুত গ্লুকোজ প্রায় সবটাই প্রস্রাবে নির্গত হয়। গ্লুকোজ চিনি অপেক্ষা কম মিষ্টি। বহুমূত্র রোগের প্রস্রাব যে মিষ্ট, তাহা আমাদের দেশের শাস্ত্র সুশ্রুতে প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আমরা যাহা কিছু খাই, তাহা দেহাভ্যন্তরে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

ভাত, রুটি, আলু, মিঠে-আলু বা অন্যান্য শ্বেতসারযুক্ত পদার্থ খুব সহজেই গ্লুকোজে পরিণত হয়। প্রোটীন জাতীয় পদার্থ, যেমন ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা—ইহাদেরও অধিকাংশ দেহাভ্যন্তরে গ্লুকোজ হয়। স্নেহপদার্থ, যেমন তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদিরও কতকটা প্রথমে গ্লিসারিন হয়, পরে এই গ্লিসারিন দেহমধ্যে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমরা যাহাই খাই না কেন, আমাদের দেহে গ্লুকোজ-সৃষ্টি হইতে অব্যাহতি নাই। মানবদেহ যেন গ্লুকোজ-সৃষ্টির একটি ছোটো কারখানা। সাধারণত এই কারখানায় খাদ্য হইতে প্রতিদিন আধ সেরের অধিক গ্লুকোজ তৈরী হয় এবং পেশীতে ধীরে-ধীরে দগ্ধ হইয়া আমাদের দেহে উত্তাপ ও শক্তি প্রদান করে এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলের সৃষ্টি হয়। এই গ্লুকোজ-দহনে অগ্ন্যাশয় হইতে প্রস্তুত ইনসুলিন নামক হরমোন (hormone) বিশেষ কার্যকরী। কিন্তু অতিভোজনের ফলে ক্রমে অগ্ন্যাশয়ে ছিদ্র হইতে আরম্ভ করে এবং বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। এই অবস্থায় দেহে যত গ্লুকোজ তৈরী হয়, তাহা প্রথমে রক্তে থাকে এবং পরে মূত্রে নির্গত হয়। যখনই রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, রক্তে ৫ গ্রামের বেশী গ্লুকোজ আছে, তখনই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বহুমূত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। তখন আহারাদি কমানো অবশ্য কর্তব্য। অনেকে মনে করেন যে, শ্বেতসারযুক্ত পদার্থ না খাইলে বা কম খাইলে বহুমূত্র রোগের সম্ভাবনা নাই; বিশেষত মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ঘি, মাখন অধিক খাইলে

বহুমূত্র হইবে না। এই ধারণা, বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন, ভুল। কারণ প্রোটীনজাত এবং স্নেহজাত পদার্থ হইতেও সহজেই গ্লুকোজ সৃষ্টি হয়। এই সকল দ্রব্য পরিপাক করিতেও যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় ও অন্যান্য দেহ-যন্ত্রের ক্লান্তি ও রোগ জন্মিতে পারে। বহুমূত্র রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সকল প্রকার খাদ্যই পরিমাণমত খাওয়া উচিত। বেশী শ্বেতসারযুক্ত পদার্থ খাওয়া খারাপ এবং বেশী আমিষ ভোজনও খারাপ। কারণ দুই ক্ষেত্রেই বহুল পরিমাণ গ্লুকোজ ও অম্লজাত পদার্থ সৃষ্ট হয়। সিদ্ধ শাক-সবজি খাইলে শরীরের উপকার হয় এবং বহুমূত্র রোগেরও সৃষ্টি হয় না, কারণ শাক-সবজি হইতে আমরা শক্তিও পাই, আবার ক্ষার-জাতীয় পদার্থও পাই। শাক-সবজিতে আরও এক হিতকর বস্তু আছে। ইহাকে সেলুলোজ বলা হয়। মানবদেহ ইহাকে হজম করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। অতিভোজন ও গুরুভোজন শরীরের পক্ষে মহাপাপ।

খাদ্যপ্রাণ—বহুকাল পূর্ব হইতে দেখা গিয়াছে যে, নাবিকরা যখন সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন কিছুকাল সমুদ্রে থাকিলেই তাঁহাদের দাঁতের মাড়ি খারাপ হয় এবং উহা হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ করে। তাজা শাক-সবজি বা পাতি লেবু খাইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। এই রোগকে 'স্কার্ভি' বলে। পূর্বে জাহাজ দ্রুত বেগে যাইতে পারিত না। সেইজন্য দুই তিন মাস পরে জাহাজ বন্দরে পৌছাইলে তবে তাজা খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাইত; এই দুই তিন মাস ধরিয়া ক্রমাগত

সংরক্ষিত খাদ্য খাইতে হইত। পরে ইংলণ্ডে আইন করা হইয়াছিল যে, জাহাজ ছাড়িবার আগে সব জাহাজেই যথেষ্ট পরিমাণ লেবু বা লেবুর রস লইতে হইবে।

গত শতকের শেষ দিকে এবং এই শতকের প্রথমে একজন ওলন্দাজ ডাক্তার—অধ্যাপক আইক্‌ম্যান দেখান যে, জাভা জেলের কয়েদীরা ছাঁটা চালের ভাত খাইয়া বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগে পা ও দেহের অন্যান্য অংশ ফুলিতে থাকে; স্নায়ুতন্ত্র (nervous system), হৃদযন্ত্র ও চক্ষু খারাপ হয়; এমন কি অনেক লোক অন্ধও হইয়া যায়। মৃত্যুও ঘটিতে পারে। সব দেশেই জেলের আহার্য অতিশয় নিকৃষ্ট। অধিকাংশ জেলেই খাদ্য পূর্ণোপকরণ নহে এবং সস্তা শ্বেতসারবহুল। এই আহার্য গ্রহণ করিলে দেহে অম্ল-পদার্থের সৃষ্টি হয়। অধুনা অনেক জেলের আহারেই উন্নতি হইতেছে। অধ্যাপক আইক্‌ম্যান লক্ষ্য করেন যে, জেলের চাল কম ছাঁটা হইলে বেরিবেরিও কম হয়। আবার চালের ছাঁটাই চালের সহিত মিশাইয়া খাইলেও বেরিবেরি কম হয়। সুতরাং অধ্যাপক আইক্‌ম্যান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চালের ছাঁটাইতে এমন জিনিস আছে, যাহার অভাবে বেরিবেরি রোগ জন্মে। সুতরাং বেরিবেরি রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে চাল বেশী ছাঁটা উচিত নহে।

১৯১২ সাল হইতে কেমব্রিজের অধ্যাপক স্যার এফ, গাওল্যাণ্ড হপ্‌কিনস্‌ দেখেন যে, পরিশ্রুত কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও প্রোটীন ইঁদুরদের খাওয়াইলে ইঁদুররা বেশীদিন

সুস্থ থাকিতে পারে না, ধীরে-ধীরে রুগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু এই পরিশ্রুত খাদ্যের সহিত একটু দুধ মিশাইয়া খাইতে দিলে ইঁদুরদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং উহারা ওজনে বাড়ে। আরও অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া অধ্যাপক হপ্‌কিনস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, সাধারণত যে কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও প্রোটীন খাইয়া সকল দেশের মানুষ জীবনধারণ করে, তাহার জন্য খাদ্যদ্রব্যগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন পাওয়া যায়, তাহাই সকলের খাওয়া উচিত। রাসায়নিক উপায়ে স্বাভাবিক খাদ্যকে পরিশ্রুত করিয়া বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ বা প্রোটীন প্রস্তুত করিয়া মিশাইয়া খাওয়াইলে ইঁদুর বেশী দিন বাঁচিতে পারে না, রুগ্ন হইয়া পড়ে। মানুষের বেলাতেও তাই। তিনি বলেন যে, সকল স্বাভাবিক খাদ্যেই স্বল্প পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ আছে, যাহার অভাবে বহু রোগের সৃষ্টি হয়।

এই দুই মনীষীর গবেষণা হইতেই খাদ্যপ্রাণের আবিষ্কার সুরু হইল। সুইডেনের 'নোবেল কমিটি' যখন খাদ্যপ্রাণের আবিষ্কারকদের পুরস্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন, তখন দেহ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার এই দুইজনকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

হপ্‌কিনসের আবিষ্কারের পর আরও তিন যুগ কাটিয়া গিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে গবেষণাও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যতগুলি খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'এ', 'বি', 'সি',

'ডি', 'ই', এবং 'কে' অন্যতম। তবে, খাদ্যপ্রাণ নানা পর্যায়ের হইলেও ইহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : (১) স্নেহ বা তৈলাক্ত পদার্থে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ, যথা, 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে' এবং (২) জলে দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ, যথা 'বি' ও 'সি'। খাদ্যপ্রাণ প্রধানত খাদ্যের পরিপাক ও দেহের পুষ্টির জন্যই প্রয়োজনীয়। তবে, ইহা সাধারণত এত অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে, দেহে শক্তির উৎস হিসাবে ইহা কোনোই কাজে লাগে না। স্থূলভাবে শরীরের পুষ্টি রক্ষা করে খাদ্য, আর সূক্ষ্মভাবে নানাদিক দিয়া শরীরের স্বাস্থ্য ও সামঞ্জস্য বিধান করে খাদ্যের অন্তর্নিহিত খাদ্যপ্রাণ।

মানবজাতি অনেকদিন হইতেই খাদ্যপ্রাণ খাইতে অভ্যস্ত, যদিও এই নামটি তাহাদের জানা ছিল না। পূর্বকালে যখন খাদ্যদ্রব্য সুলভ ছিল তখন প্রত্যেকেই খাঁটি দুধ, ঘি, ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, মাছ ইত্যাদি খাইতেন। বাংলা দেশে পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে নানাবিধ হিতকর ও মুখরোচক ফলমূলের প্রসাদ খাওয়ারও রেওয়াজ ছিল। ইহাদের প্রত্যেকটিতেই খাদ্যপ্রাণ বর্তমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির নিয়মে অনেকটা অজ্ঞাতসারেই আমাদের উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল বাঙালী যে পূর্বাপেক্ষা অনেক হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, আজকাল আমরা সেই সকল প্রাচীন ভালো প্রথা পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার মুখরোচক অখাদ্যের প্রতি

অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছি। ফলে আমাদের খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের অভাব থাকিয়া যাইতেছে।

খাদ্যপ্রাণ 'এ'—রাসায়নিক বিচারে ইহা স্টেরল নামক এক প্রকার কোহল (alcohol) জাতীয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। দেহবৃদ্ধি, শরীরের ত্বক মসৃণ ও কোমল রাখা, রোগের সহিত সংগ্রাম করা, শ্বাসযন্ত্রগুলির রস শুকাইতে না দেওয়া বা ইহাদের ঝিল্লির কোষগুলিতে কাঠিন্য প্রতিরোধ করা ইত্যাদি ব্যাপারে এই খাদ্যপ্রাণটি অপরিহার্য। শ্বসনতন্ত্রে (respiratory system) এই খাদ্যপ্রাণের অভাব-জনিত কুফলে সর্দি, কাশি, ব্রংকাইটিশ প্রভৃতি নানারকমের অসুখ বারে-বারে হইতে থাকে। কিন্তু ইহার অভাবে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে চোখের উপর,—নেত্র-বর্ত্মকলার (conjunctiva) জল শুকাইয়া যায় এবং তাহার ফলে ঐস্থানে নানারকম জীবাণু আশ্রয় লইয়া ঘা, আঞ্জনি প্রভৃতি সৃষ্টি করে; চোখের স্বাভাবিক প্রখরতাও অনেক হ্রাস পায়। দেখা গিয়াছে, যাহারা রাতকানা, তাহাদের আহার্যে এই খাদ্যপ্রাণটির অভাব। আমাদের দেশে গরীবদের মধ্যে প্রায়ই এই দোষ দেখা যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'এ' মূলত সবুজ ঘাসে উদ্ভূত হয়, জন্তুরা কিন্তু এই খাদ্যপ্রাণটি শরীরে তৈরী করিতে পারে না। দুধ, দৈ, ঘি, মাখন, ডিমের কুসুম, যকৃৎ প্রভৃতি জান্তব দ্রব্যে এই খাদ্যপ্রাণ সঞ্চিত থাকে। ইহা সব চাইতে বেশী পাওয়া যায় হালিবাট বা কড্ মাছের যকৃৎ-এ। 'কড্-লিভার অয়েল'-এর

সংগে অনেকেই পরিচিত আছেন। আমাদের দেশের মাছের মধ্যে ইলিশ মাছে ইহার আধিক্য, অন্যান্য মাছের তেলেও ইহা অল্প-বিস্তর বর্তমান।

যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহাদের জন্যও প্রকৃতিদেবী এই খাদ্যপ্রাণ সরবরাহের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। গবেষণা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সবুজ ঘাস, টাটকা তরি-তরকারি, শাক-সবজি এবং বিশেষ করিয়া গাজরে ক্যারোটিন (carotene) নামক এক প্রকার রঞ্জন-পদার্থ আছে। এই জিনিসটি যখন খাদ্যরূপে আমাদের পেটে গিয়া হজম হয়, তখন ক্যারোটিনেজ নামক যকৃৎ হইতে উদ্ভূত এক প্রকার জারক রসের সংস্পর্শে আসিয়া খাদ্যপ্রাণ 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়। এই কারণেই ক্যারোটিনকে খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র অগ্রদূত (pro-vitamin A) বলা হয়। গাজর ছাড়া রাঙা আলু, নানাপ্রকার শাক, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি প্রভৃতিতেও ক্যারোটিন আছে। সোয়াবিন আমাদের দেশে তেমন চলে না, কিন্তু ইহাতেও এই রঞ্জন-পদার্থটি বর্তমান। এছাড়া আম, পেঁপে, কমলালেবু, বিলাতী বেগুন প্রভৃতিতেও কম-বেশী ক্যারোটিন আছে। কিন্তু হজমী রসের গুণে সবটা ক্যারোটিনই খাদ্যপ্রাণ 'এ'-তে পরিণত হইবে এমন কোনো ধরাবাঁধা আইন নাই ; সুতরাং ক্যারোটিন হইতে খাদ্যপ্রাণ 'এ'-র চাহিদা মিটাইতে হইলে উহা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া দরকার। কি পরিমাণ ক্যারোটিন খাদ্যপ্রাণ 'এ'-তে রূপান্তরিত হইবে, তাহা

যকৃৎ-এর সে সময়কার কর্মতৎপরতার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

খাদ্যপ্রাণ 'বি'—এই খাদ্যপ্রাণটি বহু বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা কতকগুলি স্বতন্ত্র খাদ্যপ্রাণের সমষ্টি দ্বারা গঠিত। আজকাল তাই ইহাকে কেবল খাদ্যপ্রাণ 'বি' না বলিয়া 'সংমিশ্রিত' খাদ্যপ্রাণ 'বি' (vitamin B complex) বলা হয়। উপস্থিত খাদ্যপ্রাণ 'বি'-র যতগুলি উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের নাম হইল—থিয়ামিন, রিবোফ্ল্যাবিন, নিয়াসিন, পাইরিডক্সিন, প্যাণ্টোথিনিক অম্ল, বাইওটিন, প্যারা-এমিনো-বেঞ্জয়িক অম্ল, ইনোসিটল, কোলিন এবং ফোলিক অম্ল। ইহাদের মধ্যে থিয়ামিন, রিবোফ্ল্যাবিন, নিয়াসিন এবং প্যাণ্টোথিনিক অম্লই আমাদের শরীরের কাজে লাগে। অন্যান্যগুলির সম্বন্ধে এখনও তেমন সঠিক কিছু বলা সম্ভব নহে।

প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া থিয়ামিনের স্থান সর্বোচ্চে। শস্যের খোসায় (বহিরাবরণে), চাল ও গমের ভূষিতে এবং মদ-চোলাই করিবার খামির বা ঈস্টের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। আতপ চাল কলে ছাঁটাই করিলে উহাতে থিয়ামিন আর থাকে না, কিন্তু সিদ্ধ চাল ছাঁটাই করিলেও উহা থিয়ামিন শূন্য হয় না। বেরিবেরি রোগ প্রতিরোধ করা ছাড়াও ইহা ক্ষুধামান্দ্য নষ্ট করে, শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহায়তা করে এবং কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যের সুপরিপাক সহজতর করে। ইহার অভাবে নানাপ্রকার

স্নায়বিক দৌর্বল্য, মানসিক অবনতি, হৃদয়-দৌর্বল্য (হৃদ্‌যন্ত্রের আয়তন বাড়িয়া যায়), মস্তিষ্কে ল্যাকটিক অম্ল-সঞ্চয়ন প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ দেখা দেয়। এই খাদ্যপ্রাণটি দেহে তেমন সঞ্চিত থাকে না, তাই আমাদের খাদ্যবস্তুর দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে ইহা থাকা প্রয়োজন।

রিবোফ্ল্যাবিনও শরীর ও দেহবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ দরকারী। দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, চক্ষে ছানি-পড়া বন্ধ করা, গাত্রের ত্বক সুস্থ রাখা, নানাপ্রকার ঘা—বিশেষত মুখের কোণে—হইতে শরীর রক্ষা করা ইহার অন্যতম গুণাবলী। জান্তব পদার্থের মধ্যে দুধ, ডিম ও যকৃৎ-এ এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে বিলাতী বেগুন, খোবানি ইত্যাদিতে ইহা পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় মাছের চোখে।

দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা ভুট্টাজীবী, তাঁহারা প্রায়ই 'পেলাগ্রা' নামক এক প্রকার ত্বক-প্রদাহক রোগে ভোগেন। উদরাময় এবং মস্তিষ্ক-বিকৃতিও এই রোগের অন্যান্য কুফল। রোগের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া নিয়াসিন নামক খাদ্যপ্রাণটির আবিষ্কার সম্ভবপর হইল। নিয়াসিনের অভাবই 'পেলাগ্রা' রোগের কারণ। ইহা ভুট্টায় থাকে না। তাই যাঁহারা প্রধানত ভুট্টা খাইয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেই এই রোগের প্রবণতা দেখা যায়। ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার গরীবরা প্রায়ই এই রোগে ভোগেন। যে-যে বস্তুতে নিয়াসিন পাওয়া যায়, তাহাদের তালিকা দিতে গেলে সর্বপ্রথম নাম করিতে হয় মেটুলীর। ইহার পর আসে

ঈস্ট, মাছ, দুধ, শাক-সবজি ইত্যাদি। যাঁহারা বদহজম, অনিদ্রা, মাথা-ঘোরা, মানসিক দুর্বলতা ইত্যাদিতে ভোগেন, তাঁহাদের পক্ষে নিয়াসিন বিশেষ উপকারী।

ইহা ছাড়া যে-সকল উপাদান খাদ্যপ্রাণ 'বি'-র গোষ্ঠীভূত, তাহারা কম-বেশী প্রত্যেকেই শরীরের নানাবিধ কাজে লাগিলেও উপরোক্ত তিনটির মত নহে। তবে, উহাদের মধ্যে প্যাণ্টোথিনিক অম্ল ও প্যারা-এমিনো-বেঞ্জয়িক অম্ল চুল-পাকা-নিবারণ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে জোর গলায় এখনও কিছু বলা সম্ভবপর নহে। যকৃৎ-নির্যাসের মত ফোলিক অম্লও আজকাল রক্তশূন্যতার প্রতিকার-কল্পে ব্যবহৃত হইতেছে।

খাদ্যপ্রাণ 'সি'—স্কার্ভি রোগের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গবেষণা করিয়া জানা গিয়াছে যে, খাদ্যপ্রাণ 'সি'-র অভাবই এই রোগের প্রধান কারণ। স্কার্ভি রোগ ছাড়া আরও নানাপ্রকার বিপদ এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে ঘটিতে পারে। ইহার অভাবে রোগের সহিত যুঝিবার যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা শরীরের আছে, তাহা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে, নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি, যেমন ডিফ্‌থিরিয়া, রিউম্যাটিক ফিভার, নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মা, অতি সহজেই দেহকে আক্রমণ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে শারীরিক দুর্বলতা, স্বাভাবিক স্ফূর্তি-হ্রাস, ঘন-ঘন মাথা-ধরা, ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা, বদহজম, দাঁত খারাপ ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ দেখা দেয়। এই সকল রোগ হইতে রক্ষা

পাইবার প্রধান উপায় হইল শরীরে এই খাদ্যপ্রাণটির যাহাতে অভাব না ঘটে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা। কমলালেবু ও অন্যান্য লেবুতে এই খাদ্যপ্রাণ যথেষ্ট বর্তমান। তবে, কমলালেবুর চাইতে কাগজি ও পাতিলেবুতে ইহা আরও বেশী পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে, যে কোনো টক জিনিসেই ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। শাক-সবজি এবং ফলমূলেও ইহা অল্প-বিস্তর আছে ; কিন্তু কতখানি আছে, বা না আছে, তাহা অনেকটা নির্ভর করে ঐসব ফলমূল বা শাক-সবজি কত টাট্‌কা, তাহার উপর। আম, আনারস, পেঁপে, বিলাতী বেগুন, গাজর, শালগম, কচি পাতা, কাঁচা পেঁয়াজ, শসা, কাঁচা লংকা প্রভৃতিতে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ 'সি' বর্তমান। সাহেবরা যে কাঁচা সবজি, ফল, বিলাতী বেগুন সহযোগে সালাদ খান, তাহা এই কারণেই অতি স্বাস্থ্যকর। আমাদের দেশে আমলকীতে খাদ্যপ্রাণ 'সি' প্রচুর পরিমাণে আছে। খাদ্যপ্রাণ 'সি'-র একটা অসুবিধা এই যে, ইহা অতি ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ। তাই খাদ্যে ইহার সংরক্ষণ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন।

খাদ্যপ্রাণ 'ডি'—চতুর্থ শ্রেণীর খাদ্যপ্রাণকে 'ডি' খাদ্যপ্রাণ বলে। ইহার অভাবজনিত কুফল সাধারণত শিশু ও বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশী ফুটিয়া উঠে। প্রথমত ইহার অভাবে দেহের অস্থি বাড়িতে না পারিয়া বিকৃত হয় এবং উহাদের কাঠিন্য নষ্ট হইয়া যায়। ফলে, শিশু প্রায়ই রিকেটস্ রোগে ভোগে। পরিণত বয়সেও,

বিশেষত গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের এই খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে অস্‌টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়। অনেক দিন পর্যন্ত এই রোগে ভুগিলে প্রায়ই কুব্জতা ও বিকলাংগতার দোষ দেখা দেয়। খাদ্যপ্রাণ 'ডি'-র অভাবে দাঁতের গড়নেও নানারকম দোষ ঘটে, যথা বিলম্বে দাঁত উঠা, দাঁত পাতলা এনামেলযুক্ত হওয়া এবং উহাতে ফাটল ইত্যাদি থাকা। শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের অভাব থাকিলেও এই দোষগুলি দেখা দেয়। কাজেকাজেই রিকেটস্, বা অস্‌টিওম্যালেসিয়া বা অনুরূপ কোনো রোগের আসল কারণ নির্ধারণ প্রথমে বেশ অসুবিধাজনক ছিল। কিন্তু যখন গবেষণা করিয়া দেখা গেল যে, ক্যালসিয়াম বা ফস্‌ফরাস দিয়াও রিকেটস্ ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ করা যায় না, অথচ কড্ মাছের তেল খাওয়াইলে উহা সারিয়া যায়, তখন স্পষ্টতই বোঝা গেল যে, কড্ মাছের তেলে এমন কিছু আছে যাহা ঐ সকল রোগ সারাইবার পক্ষে অপরিহার্য। কড্ মাছের তেলের এই অন্তর্নিহিত উপাদানই খাদ্যপ্রাণ 'ডি' (খাদ্যপ্রাণ 'এ'-ও থাকে)। দুধ, মাখন, ঘি এবং ডিমের হরিদ্রা অংশেও এই খাদ্যপ্রাণটি অল্প-বিস্তর বর্তমান, কিন্তু দেহের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে উহা যৎসামান্য। আবার, কড্ মাছের তেলও আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য নহে। তাই দেহের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রকৃতিদেবী অন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের দেহের ত্বকে স্টেরল জাতীয় কয়েক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ আছে, যেমন আর্গোস্টেরল, কোলেস্টেরল ইত্যাদি। সূর্যালোক

আমাদের দেহে পড়িলে এই স্টেরল জাতীয় পদার্থগুলি, বিশেষত আর্গোস্টেরল খাদ্যপ্রাণ 'ডি'-তে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে শিশুকে তেল মাখাইয়া কিছুক্ষণ রোদে রাখার যে প্রথা আছে, তাহা এই কারণেই অতি উপকারী। ইউরোপ বা আমেরিকায় আমাদের দেশের মত রোদ নাই। কিন্তু রোদের অভাব তাহারা দূর করিয়াছে কৃত্রিম অতি-বেগুনী (ultra-violet) রশ্মির ব্যবহার দ্বারা। আগে যখন এই রশ্মির প্রয়োগ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন ইংলণ্ডে শিশুদের এই রোগ খুব হইত। জার্মানীতে তাই রিকেটস্‌কে English disease বা ইংরাজদের ব্যাধি বলা হইত। অবশ্য সরকার হইতে শিশুদের জন্য বেশী দুধের ব্যবস্থা করায় ইংলণ্ডে আজকাল এই রোগ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

খাদ্যপ্রাণ 'ই'—এই খাদ্যপ্রাণটি দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য না হইলেও অন্তঃস্বত্বা নারীদের পক্ষে ইহা বিশেষ দরকারী। কারণ এই খাদ্যপ্রাণটির অভাব ঘটিলে মাতৃগর্ভস্থ শিশু বাড়িতে পারে না। নরনারীর দেহে ইহার অভাব ঘটিলে সন্তানাদি জন্মে না। এই জন্যই এই খাদ্যপ্রাণকে সন্তানোৎপাদক বা বন্ধ্যাত্বনিবারক খাদ্যপ্রাণ বলা হয়। ডিমের ভিতরকার হল্‌দে অংশে এই খাদ্যপ্রাণটির প্রাচুর্য আছে। এতদ্ব্যতীত অঙ্কুরিত গম, ছোলা, মটর ইত্যাদিতেও ইহা পাওয়া যায়।

খাদ্যপ্রাণ 'কে'—সর্বশেষে খাদ্যপ্রাণ 'কে' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। ইহার অভাবে রক্ত তরলতর হইয়া যায় এবং

শরীরের ভিতরকার বিভিন্ন অংশ হইতে অবিরত রক্তক্ষরণ হইতে থাকে। নবজাত শিশুদের মধ্যে প্রায়ই এই খাদ্য-প্রাণটির অভাব দেখা যায়। শূয়রের যকৃৎ-নির্যাস, সিদ্ধি ও সোয়াবিনের বীজ, চালের ভূষি এবং নানারূপ শাক-সবজিতে ইহা পাওয়া যায়।

খাদ্য-জাত উত্তাপ—এইবার দেহে খাদ্য যে শক্তি বা উত্তাপের সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খাদ্য দেহাভ্যন্তরে ধীরে ধীরে দগ্ধ হয় এবং এই দহনকার্য হইতেই তাপ ও শক্তি পাওয়া যায়। যেমন কয়লা দগ্ধ হইয়া উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তাপ জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া রেল-ইঞ্জিনে শক্তি সঞ্চার করে, পেট্রোল যেমন ডিসেল ইঞ্জিনে দগ্ধ হইয়া মোটরগাড়ীকে চালায়, খাদ্যও সেইরকম দেহাভ্যন্তরে অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া দগ্ধ হয় এবং জীবদেহে তাপ ও শক্তির সৃষ্টি করে। সাধারণত জীবকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) উষ্ণ-শোণিত (warm-blooded) এবং (২) শীতল-শোণিত (cold-blooded) জীব। মানুষ, গৃহপালিত পশুপক্ষী উষ্ণ-শোণিত শ্রেণীভুক্ত। সাপ, কুমীর, ব্যাং, কচ্ছপ, মাছ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। উষ্ণ-শোণিতবিশিষ্ট জীবগুলি বাহিরের আবহাওয়া অপেক্ষা অধিকাংশ সময় উষ্ণতর থাকে, যেমন শীত বা গ্রীষ্মে মানুষের দেহের তাপ সব সময়েই ৩৭° সেঃ (সেণ্টিগ্রেড্)। কুকুরের তাপ সময়-সময় ৩৯-৪০° সেঃ হয়; মুরগিরও সময়-সময় ৪০-৪১° সেঃ হয়। মৎস্য ও সরীসৃপজাতীয়

প্রাণীর দেহের উত্তাপ ও কর্মকুশলতা বাহিরের আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। শীতকালে তাহাদের দেহের তাপ ও চলাফেরার ক্ষমতা গ্রীষ্মকাল হইতে অনেক কম। শীতকালে তাহাদের আভ্যন্তরীণ দহনক্রিয়াও মন্দীভূত হইয়া যায়। এই কারণেই সরীসৃপজাতীয় জীব খাদ্য না পাইলেও শীতকালে অনেকদিন পর্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। গ্রীষ্মকাল পড়িলে তাহারা সূর্যালোকে আসিয়া দেহকে গরম করিয়া লয় এবং চলাফেরা ও খাদ্যের অন্বেষণ আরম্ভ করে। পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশে মানুষের পোষাক এরূপভাবে তৈরী যে, সাধারণত দেহের এক-পঞ্চমাংশ বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসে। সেখান হইতেই উত্তাপ বহির্গত হয়। অপর চার ভাগ থাকে বস্ত্রে আবৃত, খুব কম উত্তাপই ঐ স্থান হইতে অপচিত হইতে পারে।

দেখা গিয়াছে যে, এক সের বিশুদ্ধ চাল বা চিনি বা আমিষ জাতীয় কোনো পদার্থ, যথা মাছ, মাংস, বা ডিম দেহাভ্যন্তরে দগ্ধ হইলে ৪১০০ কিলো-ক্যালোরী উত্তাপ জন্মে (এক সের জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, তাহাকে এক কিলো-ক্যালোরী বলা হয়)। এক সের স্নেহদ্রব্য দগ্ধ হইলে ৯১০০ কিলো-ক্যালোরীর সৃষ্টি হয়। সেইজন্য তৈলাক্ত পদার্থ অল্প খাইলেও কার্বোহাইড্রেট অপেক্ষা বেশী উত্তাপ পাওয়া যায়। যাঁহারা খুব বেশী দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাঁহাদের দেহের ওজন সের হিসাবে ধরিয়া ৩৫ দিয়া গুণ করিলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাদ্য-পরিমাণের

হিসাব পাওয়া যায়। অর্থাৎ যদি কাহারো ওজন ৭০ সের হয়, তাহা হইলে তাঁহার ৭০ × ৩৫ = ২৪৫০ কিলো-ক্যালোরী-উৎপাদক আহার্য প্রত্যহ খাওয়া দরকার। যাঁহারা আরও বেশী দৈহিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের আরও বেশী খাদ্যদ্রব্য দরকার। চাষী, মজুর, কাঠুরিয়াদের গড়ে ৪০০০ কিলো-ক্যালোরী-উৎপাদক খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। খেলোয়াড় ও পালোয়ানরা ন্যূনাধিক ৫০০০ ক্যালোরী-উৎপাদক খাবার খাইয়া থাকেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বেশী পরিশ্রম করিলে দেহের দহনক্রিয়া বৃদ্ধি হয় এবং সেইজন্য অধিক খাদ্যের প্রয়োজন। আবার যাঁহারা কায়িক পরিশ্রম কম করেন, তাঁহাদের অল্প খাওয়া উচিত ; কারণ বেশী খাইলে তাহা দেহে দগ্ধ হইবে না এবং অযথা উহার অপচয় হইবে।

কোনো কাজকর্ম না করিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিলে প্রত্যহ ১৬০০ কিলো-ক্যালোরী তাপ দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। ইহাকে বেসিক মেটাবলিস্‌ম্ (basic metabolism) বলে। যদি কেহ এমন খাদ্য খান যাহা হইতে ১৬০০ কিলো-ক্যালোরী উত্তাপ সৃষ্টি হয় না, তাহা হইলে তাঁহার দেহ কৃশ হইতে আরম্ভ করে এবং ওজন কমিতে থাকে। যতদিন জীবদেহে প্রাণ থাকে, ততদিন পর্যন্ত দেহের দহনকার্য চলিতে থাকে। এই দহনক্রিয়াই জীবনের মূলসূত্র। দহনকার্য বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়। অনশনের সময় দেহের পেশী ও স্নেহপদার্থ দগ্ধ হয় এবং দেহ কৃশ হয়। বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে, অনশনের প্রথম দিকে দৈনন্দিন প্রায় ১৬০০ কিলো-ক্যালোরী

উৎপাদিত হয় এবং এই শক্তি-উৎপাদনে দেহের স্নেহপদার্থ ও পেশী দগ্ধ হয়। এই ১৬০০ কিলো-ক্যালোরী উত্তাপের অধিকাংশ—শতকরা ৮৭ ভাগ আসে স্নেহপদার্থ হইতে, এবং অপর ১৩ ভাগ উৎপাদিত হয় পেশীর দহন হইতে। স্থিরভাবে থাকিলে এবং কাজকর্ম না করিলে দহন কম হয়, তবে সাধারণত ১৬০০ কিলো-ক্যালোরীর কম হয় না। দেখা যায় যে, অনশনে প্রত্যহ প্রায় আধসের স্নেহপদার্থ ও পেশী ধ্বংস হয় এবং প্রায় তিন পোয়া জল নিষ্কাশিত হয়। অনশনে দেহ কৃশ হয় এই কারণেই। চার পাঁচ দিন অনশন করিলে ৫ হইতে ৬ সের ওজন কমে। এই হ্রাসে বেশী ক্ষতি না হওয়ারই সম্ভাবনা। আরও বেশীদিন অনশন করিলে দেহে বিষাক্ত বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং সাবধান না হইলে তাহা হইতে মৃত্যু ঘটিতে পারে।

আমরা যখন উপবাস করি, তখন দেহের গ্লাইকোজেন (শ্বেতসারের মত জিনিস) সত্বর গ্লুকোজে পরিণত হইয়া ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়। সেইজন্য দেহের স্নেহপদার্থ ও মাংসপেশী ধীরে ধীরে জীর্ণ হইতে থাকে। সুস্থ শরীরে মানুষ যখন সাধারণভাবে আহারাদি করেন, তখন দেহের উত্তাপ ও শক্তির অধিকাংশই কার্বোহাইড্রেট, অর্থাৎ ভাত, রুটি, চিনি জাতীয় পদার্থের দহন হইতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির খাদ্যদ্রব্যের তালিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, খাদ্য হইতে শক্তি ও তাপের ⅘ ভাগ কার্বোহাইড্রেট হইতে এবং ⅕ ভাগ স্নেহ ও আমিষ পদার্থ

হইতে উদ্ভূত হয়। উপবাসের সময় কার্বোহাইড্রেট দেহে আর থাকে না, কিংবা খাওয়াও হয় না। সেইজন্য স্নেহপদার্থ ও পেশী দ্রুত দগ্ধ হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্নেহপদার্থ দ্রুত দগ্ধ হইলে বিষাক্ত অ্যাসিটোন পদার্থের সৃষ্টি হয়। সাধারণত স্নেহপদার্থ যখন কার্বোহাইড্রেটের সহিত মিলিতভাবে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন কার্বোহাইড্রেটের মতই দগ্ধ হইয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলের সৃষ্টি করে। কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের অভাবে স্নেহপদার্থ দ্রুত দগ্ধীভূত হইলে কতকটা বিষাক্ত অ্যাসিটোন জন্মে। বহুমূত্র রোগেও যতই চিনি, ভাত, রুটি খাওয়া যাক না কেন, তাহা দেহে দগ্ধ (বা কার্যকরী) হয় না—প্রায় সবটাই গ্লুকোজরূপে মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। জীবনধারণের জন্য তখন বহুমূত্ররোগীর স্নেহদ্রব্য ও মাংসপেশী দগ্ধ হইতে থাকে। এই কারণেই খাবার খাইলেও বহুমূত্ররোগীর দেহ ক্রমেই শুকাইয়া যায়। বহুমূত্রে ইনসুলিন প্রয়োগ করিলে গ্লুকোজ-দহনে সহায়তা হয় এবং স্নেহ ও প্রোটীন পদার্থ ধ্বংস হয় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অনশনে ও বহুমূত্র রোগে দেহে রাসায়নিক প্রক্রিয়া একই হইয়া থাকে। বিষাক্ত অ্যাসিটোন কমাইতে সোডিয়াম টার্টারেট ও সোডিয়াম সাইট্রেট জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়া উচিত। এলাহাবাদে আমরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছি যে, টার্টারেট ও সাইট্রেট দেহে দগ্ধ হইয়া শক্তি উৎপাদন করে। ইহা অ্যাসিটোন পদার্থও কমাইয়া দেয় এবং অম্লাক্ত পদার্থ, যাহা চর্বির দ্রুত দহন হইতে সৃষ্টি হয়

তাহাকে প্রশমিত (neutralize) করে। সোডিয়াম টার্টারেট এবং সোডিয়াম সাইট্রেট অনশনের সময় ও বহুমূত্র রোগে খাইলে প্রভূত উপকার হয় এবং diabetic coma হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

দেহে বিষাক্ত পদার্থের অপকারিতা নষ্ট করিতে জলও যথেষ্ট কার্যকরী। উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে জলের ভাগই বেশী। নবজাত শিশুর দেহে শতকরা ৬৮ ভাগ জল, বয়স বাড়িতে থাকিলে জলের ভাগও কমিতে থাকে। বৃদ্ধ অবস্থায় জীবদেহে সাধারণত ৫৭-৫৮ ভাগ জল থাকে। সেইজন্য তখন প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল খাওয়া উচিত।

কয়েকটি চলিত খাদ্য-দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১) দুধ—যাবতীয় খাদ্যবস্তুর মধ্যে দুধের স্থান সর্বোচ্চে। পুষ্টির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সবটাই প্রায় যথাযথ পরিমাণে দুধে বর্তমান। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য হিসাবে ইহার মূল্য অতুলনীয়। কিন্তু বয়স্থ ব্যক্তিদের পক্ষে দুধকেই একমাত্র খাদ্য হিসাবে ধরায় কিছু অসুবিধা আছে। প্রায় সব জন্তুর দুধই একই রকম উপাদানে প্রস্তুত, তবে বিভিন্ন জন্তুর দুধে উপাদানের পরিমাণে কিছু তারতম্য ঘটে।

সকল দেশেই দুধকে খাদ্যের এক প্রধান অংগ বলিয়া ধরা হয়। ভারতীয়দের নিকট ইহা প্রায় অপরিহার্য। ইউরোপীয়দের নিকট যেমন মাংস, ভারতীয়দের নিকট

তেমনি দুধ। ভারতীয়দের মধ্যে একটা বিরাট অংশ মাছ, মাংস, ডিম ছোঁনই না। কাজেকাজেই জান্তব প্রোটীন ও স্নেহপদার্থের জন্য তাঁহাদের দুধ বা দুধের তৈরী জিনিসের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নাই। আজকাল দুধ দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্যও বটে। ফলে কম-আয়ের ব্যক্তিরা ইহা তেমন উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে পান না বলিয়া তাঁহাদের শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে, 'দুগ্ধম্ অমৃতম্'। আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে একথা খুবই খাঁটি।

ভারতবর্ষে সাধারণত দুই প্রকার দুধ ব্যবহৃত হয়—গরুর ও মহিষের। পাহাড় অঞ্চলে কিছু কিছু ছাগলের দুধেরও ব্যবহার দেখা যায়। মহিষের দুধে গরুর দুধের প্রায় দ্বিগুণ স্নেহপদার্থ বর্তমান। ছোটোদের পক্ষে ইহা তাই জল দিয়া তরল না করিয়া খাওয়া খারাপ। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধারণত দুধকে pasteurise করা হয় অর্থাৎ দুধ ৩০ মিনিটের জন্য ১৪৩° ফাঃ উত্তাপে অথবা ১৫সেঃ ১৬০° ফাঃ উত্তাপে গরম করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় দুধের জীবাণুগুলি মরিয়া যায়, অথচ দুধের পুষ্টিকর পদার্থ অবিকৃত থাকে।

গোয়ালারা সাধারণত দুধে যে সকল দ্রব্যের ভেজাল মিশায় জল তাহাদের অন্যতম। কেবল জল মিশাইলেও কথা ছিল না, অনেক সময় নানারকম জীবাণুযুক্ত ময়লা জলও ব্যবহার করে। এই কারণে দুধ সর্বদা ফুটাইয়া খাওয়া

উচিত। দুধ ফুটাইলে উহার খাদ্যপ্রাণ কিছুটা অবশ্য নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহাও মন্দের ভালো। শিশুর খাদ্য-হিসাবে মাতৃস্তন্য হইতে গরুর দুধ নিকৃষ্টতর। শিশুদের যদি ইহা খাওয়াইতেই হয়, তবে কিছু জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাতে কিছু ক্রীম ও ল্যাকটোজ মিশাইয়া খাওয়ানো উচিত। পুষ্টির দিক দিয়া বিচার করিলে মাংসের প্রোটীন ও দুধের প্রোটীন সমতুল্য। ম্যাকলেস্টারের মতে আরবদের শারীরিক গঠন ও অতুলনীয় শৌর্য-বীর্যের কারণই হইল যে, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে দুধ (সব জানোয়ারের) বা দুধে-প্রস্তুত জিনিস খাইয়া থাকেন। বিলাতে আজকাল প্রায় সকল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিনের সময় দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগে যেখানে মদ বিক্রী হইত, সেইখানে আজকাল দুধ বিক্রী হয়। প্রোটীন, স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট ছাড়াও দুধে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস এবং খাদ্যপ্রাণ 'এ' 'বি' ও 'সি' বর্তমান। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণও উপযুক্ত পরিমাণে আছে। তবে, দুধে লৌহঘটিত পদার্থের পরিমাণ কম। শরীরের লৌহ-পদার্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অন্য খাদ্যের (যথা, শাক) সাহায্য লওয়া দরকার।

(২) **মাখন**—দুধ হইতে প্রস্তুত জিনিসের মধ্যে মাখন অন্যতম। ভালো মাখনে প্রায় ৮০-৮৫ ভাগ স্নেহপদার্থ ও ১৫-২০ ভাগ জল থাকে। অনেকে মনে করেন যে, স্নেহজাত পদার্থের মধ্যে মাখনই সব চাইতে সহজে হজম হয়। ইহাতে

প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও 'ডি' থাকে। গরু ও মহিষ উভয়ের দুধ হইতেই ভারতবর্ষে মাখন প্রস্তুত করা হয়। তবে গরুর দুধ হইতে তৈরী মাখনের দাম বেশী। ভারতীয়রা কিন্তু মাখনের চাইতে ঘি বেশী ব্যবহার করেন। অন্যান্য যে কোনো খাদ্যবস্তু অপেক্ষা ঘি, মাখন ও তেলের শক্তি-উৎপাদন ক্ষমতা অধিক। কিন্তু ঘির চাইতে মাখনে খাদ্যপ্রাণের অনুপাত বেশী।

(৩) ঘি—মাখন গালাইয়া ইহা তৈরী হয়। সকল ভারতীয় গৃহেই ইহা খাদ্যের এক অপরিহার্য অংগ। যত প্রকার স্নেহদ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে ঘি সব চাইতে সুপাচ্য এবং ইহাতে খাদ্যপ্রাণও বেশ বর্তমান। শক্তিপ্রদ খাদ্যের মধ্যে ইহা অন্যতম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে ঘির উপরেই ভেজালকারীদের দৃষ্টি বেশী। খাদ্য ও অখাদ্য কত রকম জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল ইহাতে মিশানো হয়! বাজারে যেসব বস্তু 'উদ্ভিজ্জ ঘি' বা 'বনস্পতি ঘি' নামে চলে, তাহাতে ঘি থাকে না আদৌ, খাদ্যপ্রাণও থাকে না মোটেই। ভারতীয় সব রকম খাদ্যেই ঘির ব্যবহার খুব বেশী। লুচি, পরোটা ইত্যাদি তৈরী করিতে ইহা প্রায় অপরিহার্য। ঘি যে ভালো খাবার, তাহা চার্বাক মুনি বহু পূর্বে বুঝিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'!

(৪) দই—দুধকে ল্যাকটিক অম্ল-জীবাণু দ্বারা গাঁজাইলে দই হয়। এই প্রক্রিয়ায় একমাত্র দুগ্ধ-শর্করাই পরিবর্তিত

হইয়া ল্যাকটিক অম্লে পরিণত হয় এবং সেই অম্ল দুধকে জমাট করে। ইহাতে দুধের অন্যান্য পুষ্টিকর দ্রব্য প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। অনেক লোক দুধের চাইতে দইকেই বেশী পছন্দ করেন। কারণ ইহা সহজে হজম করা যায়। গাঁজনদ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত দই-এর আরেকটা ক্ষমতা আছে যে, উহা অন্ত্রে পচনক্রিয়া-সহায়ক যেসকল জীবাণু আছে, তাহা ধ্বংস করে। মেচ্‌নিকফের মতে, এই জীবাণুরা পচনক্রিয়া দ্রুততর করে এবং অকালবার্ধক্য আনয়ন করে। গ্রীষ্মকালে দই হইতে প্রস্তুত ঘোল আমাদের শ্রান্তি নিবারণ করে। দই-এ যেসব জীবাণু আছে, তাহা বাহিরের জীবাণুর সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাদের ধ্বংস করে।

(৫) ছানা—দুধে যদি কোনো অম্ল পদার্থ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুধ জমাট বাঁধিয়া যায় এবং দুধের ঘন অংশটা—যাহাকে কেসিন বলে—কিছু স্নেহদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পৃথক হইয়া পড়ে। ইহাকে ছাঁকিয়া নিলেই আমরা ছানা পাই। যত রকম প্রোটীন আছে, তাহার মধ্যে ছানা অন্যতম। এক হিসাবে ইহা মাছ বা মাংসের প্রোটীন হইতেও হয়তো শ্রেষ্ঠ, কারণ মাছ বা মাংসের প্রোটীনের মত ছানার প্রোটীনে কোনো পিউরিন (purine) দ্রব্য নাই। মিতব্যয়িতার দিক দিয়াও ছানার মূল্য কম নহে, কারণ মাছ বা মাংসের মত ইহার কোনো অংশ ফেলা যায় না। ছানার তৈরী মিষ্টি ভারতীয়দের গৃহে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ অন্যতম। পরিপাকের ও পুষ্টির

দিক দিয়া ভারতীয় মিষ্টির মধ্যে সন্দেশ শ্রেষ্ঠ। খুব ভালো সন্দেশে ২৩ ভাগ প্রোটীন ও ১৮ ভাগ স্নেহদ্রব্য বর্তমান।

(৬) পনির—দুধে রেনেট (rennet) দিয়া যে ছানা প্রস্তুত হয়, তাহাকে গাঁজাইয়া চাপ দিলে এবং পরে শুকাইয়া লইলে পনির তৈরী হয়। ইহাও অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইউরোপীয়দের মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন আছে। মাছ, মাংস বা ডালের চাইতেও ইহাতে প্রোটীনের ভাগ অধিক। স্নেহপদার্থও ইহাতে বর্তমান (ছানাতে প্রায় নাই)। পনিরে মাঝে মাঝে টাইরোটক্সিকন নামে একপ্রকার বিষের সৃষ্টি হয়, তাহা খাইলে কলেরার মত রোগ হয়। পনির খুব লঘুপাক দ্রব্যও নহে।

(৭) জমাট দুধ—বায়ুশূন্য অবস্থায় চিনি দিয়া বা না দিয়া দুধকে অল্প তাপে ঘন করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। কোনো কোনো জমাট দুধে স্নেহপদার্থ কম থাকে এবং সাধারণত ইহাতে খাদ্যপ্রাণেরও অভাব দেখা যায়। তবে, যেখানে খাঁটি দুধের অভাব, সেখানে ইহা ব্যবহার করা চলে।

(৮) মাংস—প্রোটীনের জন্য মাংসই পৃথিবীর প্রায় সব স্থানে ব্যবহৃত হয়। মাংসের প্রোটীন সহজেই পরিপাক করা যায় এবং ইহার আশোষণও (absorption) খুব সহজসাধ্য। লাল মাংসের (গরু, ভেড়া, শূকর বা ছাগলের মাংস) চাইতে সাদা মাংস (যথা, গৃহপালিত মুরগি, খরগোস ইত্যাদির মাংস) অধিকতর সহজপাচ্য। তবে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস খুব বেশী খাওয়া উচিত নহে। মাংসে অনেক

সময় পরজীবী ও জীবাণু আশ্রয় করে। তাই মাংস-নির্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মাংস সুপক্কও হওয়া চাই, তা' না হইলে তদাশ্রিত পরজীবী বা জীবাণুরা মারা পড়ে না। অনেক সময় যে-সব মাংসে পচন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে টোমাইন (ptomaines) নামক একপ্রকার ক্ষারগুণবিশিষ্ট বিষের সৃষ্টি হয়। ইহা রন্ধন করিলেও অনেক সময় নষ্ট হয় না। এই মাংস খাইলে ভীষণ পেটের গোলমাল দেখা দেয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটা অসম্ভব নহে।

মাংসের নির্যাস, ঝোল (soups) ইত্যাদিতে পুষ্টিকর পদার্থ তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তবে ইহারা উত্তেজকের কাজ করে বটে।

সকল দেশেই মানুষ সাধারণত মাংসপেশী খাইয়া থাকেন। অথচ যকৃৎ ও মেটুলী মাংসপেশী অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর; কারণ উহাতে খাদ্যপ্রাণ 'বি' ও লৌহঘটিত পদার্থ অনেক বেশী থাকে।

(৯) মাছ—জান্তব পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে মাছের স্থান মাংসের পরেই। মাংসের চাইতে মাছে জলের ভাগ বেশী এবং মাংসের চাইতে ইহা সুপাচ্য। বাঙালীদের মাছ অতি মূল্যবান প্রোটীন-প্রদায়ক খাদ্য। বাংলা দেশে রুই মাছ সব চাইতে অভিজাত শ্রেণীর। ইহাতে প্রায় ১৮% প্রোটীন ও ৮% তেল (স্নেহপদার্থ) বর্তমান। ইলিশ মাছে তেলের পরিমাণ একটু বেশী, তাই ইলিশ অপেক্ষাকৃত গুরুপাক। কই, মাগুর, শিংগী মাছে শতকরা ১ ভাগের কম তেল থাকায়

রোগীর জন্যই ইহাদের বিশেষ ব্যবহার। অর্থনীতির বিচারে কিন্তু মাছ তেমন লাভজনক নহে, কারণ কাঁটা, আঁশ ইত্যাদিতেই ইহার প্রায় ৫০% ফেলা যায়। গলদা বা বাগ্‌দা চিংড়ী একটু দুষ্পাচ্য। অনেক সময় অতিরিক্ত পরিমাণে চিংড়ী খাইলে শরীরে নানারকম ঘা, ফোঁড়া ইত্যাদি বাহির হয়।

বিশেষ কয়েক জাত ছাড়া মাছ সাধারণত কোনো প্রকার রোগ বহন করে না। কিন্তু মাছ অতি পচনশীল এবং পচা মাছ বিষাক্ত। লোনা বা শুঁটকী মাছ তাজা মাছের চাইতে কম পুষ্টিকর। মাছের তেলেও প্রচুর খাদ্যপ্রাণ থাকে। কড্‌ মাছের তেল এই হিসাবে শ্রেষ্ঠ। মাছের ডিমেও যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ বর্তমান।

(১০) ডিম—দুধের পরেই ডিম আরেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য। ইহা প্রোটীন, স্নেহদ্রব্য ও খাদ্যপ্রাণে ভর্তি। ডিমের কুসুমে খুব প্রয়োজনীয় ফস্‌ফরাস ও লৌহ-লবণ বর্তমান। চাল-প্রধান খাদ্যের সহিত ডিম খাইলে প্রোটীন ও স্নেহজাত দ্রব্যের অভাব মেটে। আমাদের দেশের যুবকদের খাদ্যে ডিমের বহুল প্রচলন হওয়া আবশ্যক। হাঁসের ডিম মুরগির ডিমের চাইতে নিকৃষ্ট নহে। ইহার আকার বড়ো হওয়াতে ইহাতে পুষ্টিদ্রব্যও অধিক। তবে, অনেকে হাঁসের ডিমের গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া মুরগির ডিম বেশী পছন্দ করেন। ডিম অর্ধসিদ্ধ করিয়া খাওয়াই উচিত। কড়া ভাজা ডিম হজম করা একটু শক্ত। ডিমে 'পিউরিন' পদার্থ

নাই। অনেকের ধারণা ডিম খাইলে নাকি বাত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিচারে এই ধারণার কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না।

(১১) **চাল**—বাঙালী, আসামী, উড়িয়া, মাদ্রাজী ও আরও অনেক এসিয় জাতির ইহাই প্রধান খাদ্য। ধান হইতে চাল বাহির করিবার সাধারণত দুই প্রকার প্রথা আছে। ধানকে রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া চাল বাহির করা হয়। ইহাকে আতপ চাল বলে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও বিধবারা এই চাল ব্যবহার করেন। সাধারণত ধান জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া যে চাল বাহির করা হয় তাহাকে সিদ্ধ চাল বলে। পুষ্টির দিক দিয়া সিদ্ধ চালের চাইতে আতপ চাল অধিকতর উপকারী। শস্যাদির মধ্যে চালেই সব চাইতে কম প্রোটীন। স্নেহপদার্থ ও লবণও ইহাতে কম। কলছাঁটা সাদা চালে খাদ্যপ্রাণ খুব কম থাকে। এই চাল বেশী খাইলে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয়। আমরা সাধারণত ভাতের ফেন ফেলিয়া দেই। ইহা অতি ভুল। কারণ ভাতের ফেনে চালের প্রোটীন, লবণ ও খাদ্যপ্রাণের একটা বড়ো অংশ বাহির হইয়া যায়। চাল, ডাল, ঘি, শাক-সবজি, আলু, মটর, কপি ইত্যাদি সহযোগে খিচুড়ি অতি উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য। চাল শক্তি-উৎপাদক হিসাবে খুব মূল্যবান। ইহার মধ্যে যে শ্বেতসার আছে, তাহা সহজেই হজম করা যায়। চালে চূণ-জাতীয় পদার্থ, যাহা অস্থি-গঠনে প্রয়োজন, কম পরিমাণে

আমাদের খাদ্য নির্মল...

বিদ্যমান। তাই ভাতের সংগে ডাল, সবজি ইত্যাদি খাওয়া দরকার। চাল যেখানে প্রধান খাদ্য, সেখানে প্রোটীন, স্নেহপদার্থ, লবণ ও খাদ্যপ্রাণের অভাব মিটাইবার জন্য ডাল, সবুজ শাক-সবজি, দুধ বা দুধের তৈরী দ্রব্য, ফলমূল ইত্যাদি খাওয়া অবশ্য কর্তব্য।

ধান সিদ্ধ করিয়া খোলায় নাড়িয়া ঢেঁকিতে কুটিলে চিঁড়া হয়। গরম বালির খোলায় চাল ভাজিলে হয় মুড়ি, ধান ভাজিলে খই। বাংলা দেশে অনেকেই মুড়ি, চিঁড়া, খই সকাল-বিকালে জলযোগের সময় আহার করিয়া থাকেন। ইহাদের সংগে ছোলা, নারিকেলের শাঁস, গুড় ইত্যাদি যদি খাওয়া যায়, তাহা হইলে সে-খাবার বাজারের পচা এবং খারাপ ঘি ও মালমসলায় তৈরী মিষ্টির চাইতে বহুগুণ উৎকৃষ্টতর হয়। চালে-দুধে সিদ্ধ করা পায়স এবং চাল গুঁড়াইয়া যে সফেদা হয় তাহা হইতে প্রস্তুত রুটি, পিঠা ইত্যাদি উপাদেয় আহার্য।

(১২) গম—ভারতবর্ষের সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে এবং পৃথিবীর বহু স্থানে ইহার প্রচলন। চালের চাইতে প্রোটীনের অনুপাত ইহাতে বেশী। গমের সংগে প্রচুর পরিমাণে ডাল খাওয়া হয় বলিয়া দেখা গিয়াছে যে, যাঁহারা গম খান, তাঁহারা চাল-খাইয়েদের চাইতে অনেক বলবান ও স্বাস্থ্যবান। ময়দার চাইতে আটায় প্রোটীন ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ বেশী। তাই ময়দার চাইতে আটা খাওয়াই শ্রেয়। আটা বা ময়দা দিয়া চাপাটি, পুরি ইত্যাদি

বানানো যায়। বিলাতী পাঁউরুটির চাইতে চাপাটিতে প্রোটীনের ভাগ বেশী এবং জলের ভাগ কম। তবে, পাঁউরুটির চাইতে চাপাটি কম সেঁকা হয় বলিয়া পাঁউরুটির চাইতে ইহা হজম করা কঠিন। বিলাতী পাঁউরুটি ঈস্ট বা বেকিং পাউডার সহযোগে ফোলানো হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত হালকা ও ফোঁপ্‌রা বলিয়া পাকস্থলীর জারক রস ইহার উপর সহজেই কাজ করিতে পারে।

গমের ভূষিতে যথেষ্ট লবণ ও খাদ্যপ্রাণ থাকে। গম হইতে সুজিও পাওয়া যায়। ময়দা বা আটার চাইতে ইহাতে প্রোটীন বেশী, তবে শ্বেতসার কম। রোগীদের পথ্যরূপে ইহার বেশ ব্যবহার আছে এবং নানারকম মিষ্টি, পিঠা ইত্যাদিতেও ইহার প্রয়োগ হয়। ক্যালসিয়াম শরীরস্থ হওয়ার সংগে খাদ্যপ্রাণ 'ডি' ছাড়া ফাইটিক-অম্ল নামক একটি পদার্থেরও বিশেষ যোগ আছে। গমের লাল অংশের ভিতর এই অম্ল থাকে। ইহা শরীরের ক্যালসিয়ামের সহিত যুক্ত হইয়া উহাকে অদ্রবণীয় বস্তুতে পরিণত করে। ফলে, শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমিতে থাকে। গমের যে অংশ দ্বারা রুটি প্রস্তুত করা হয়, যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে তাহার মাত্রা বাড়াইয়া ৮৫% করা হইল। ইংলণ্ডের খাদ্য-বিজ্ঞানীগণ তখন নির্দেশ দিলেন যে, রুটির আটার সহিত ক্যালসিয়ামযুক্ত পদার্থ এমনভাবে মিশাইতে হইবে যাহাতে ফাইটিক-অম্ল দ্বারা কিছুটা ক্যালসিয়াম নষ্ট হইলেও শরীরে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম থাকিয়া যায়।

(১৩) **ওট (oat)**—ইহাতেও বেশ প্রোটীন ও স্নেহ-পদার্থ বর্তমান। সকল প্রকার শস্যের মধ্যে লৌহজাত পদার্থ ইহাতে অধিক। ইহাতে চূর্ণও আছে যথেষ্ট। দুধ সহযোগে ওট উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য।

(১৪) **ডাল**—প্রোটীনের প্রাধান্য থাকায় ভারতীয় খাদ্যে ইহা মাংসের স্থান অধিকার করে। প্রোটীন ছাড়াও ডালে যথেষ্ট শ্বেতসার, লবণ ও খাদ্যপ্রাণ 'বি' পাওয়া যায়। চাল-প্রধান খাদ্যে ইহা প্রোটীন ও লবণের অভাব দূর করে। তবে, ডালে স্নেহপদার্থ কম। এইজন্য ডাল রান্না করিতে সর্বদা ঘি বা তেল ব্যবহার করা হয়। ডালে প্রোটীনের আধিক্য থাকিলেও জৈব-মূল্য (Biological value) হিসাবে এই প্রোটীন ছানা, মাছ, মাংস বা ডিমের প্রোটীনের চাইতে নিকৃষ্ট। তাই যাঁহারা নিরামিষাশী, তাঁহাদের ডালের সংগে সংগে দুধ বা দুধে-প্রস্তুত দ্রব্য খাওয়া উচিত। বাঙালীরা বদহজমের ভয়ে উপযুক্ত পরিমাণ ডাল খাইতে চান না। কিন্তু ডাল যদি ভালো করিয়া রান্না করা যায়, তাহা হইলে ইহার প্রোটীনের এক বিরাট অংশ (৯২%) দেহযন্ত্রের ব্যবহারে লাগে (মাংস বা দুধের বেলায় প্রায় ৯৭%)। আমাদের দেশীয় ডালের মধ্যে মুগ অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য এবং রোগীদের পথ্যে ইহার ব্যবহারও যথেষ্ট হয়। মসূরের ডালে প্রোটীনের পরিমাণ সর্বাধিক। ইউরোপীয়রাও ইহা দ্বারা সূপ প্রস্তুত করেন। ছোলার ডালে স্নেহপদার্থ প্রচুরতম এবং ইহা খাইতেও সুস্বাদু। খেসারীর ডাল বেশী খাইলে একরকম

রোগ দেখা দেয়, যাহার ফলে দেহের নিম্নভাগ অবশ হইয়া যায়। ইহাকে ল্যাথিরিস্‌ম্ (lathyrism) বলে। কলাইয়ের ডালে আঠালো দ্রব্য প্রচুর থাকে। তাই পেটের গোলমাল হইলে এই ডাল খাইতে দেওয়া হয়।

(১৫) **উদ্ভিজ্জ তেল**—ভারতবর্ষে রান্নার জন্য যত রকম উদ্ভিজ্জ তেলের ব্যবহার আছে, তাহার মধ্যে সরিষার তেলের ব্যবহার বাংলা দেশে প্রায় একচেটে। দক্ষিণ ভারতে তিল ও নারিকেল তেলের প্রচলন বেশী। ইউরোপীয়রা সাধারণত অলিভ (জলপাই) তেল ও বাদাম তেল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তেলের প্রধান কাজ শক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি করা। পরিপাকগুণ ও খাদ্যপ্রাণের দিক দিয়া মাখন বা ঘি হইতে তেল নিকৃষ্ট। বহু উদ্ভিজ্জ তেলে কোনো খাদ্যপ্রাণই থাকে না। এ সকল তেল সস্তা সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘি বা মাখনের পরিবর্তে ইহাদের ব্যবহার ঠিক অনুমোদন করা যায় না।

(১৬) **তরি-তরকারি**—তরি-তরকারির মধ্যে আলু শ্রেষ্ঠ। আলুর প্রোটীন অংশ অল্প হইলেও বেশীর ভাগ উদ্ভিজ্জ প্রোটীনের চাইতে ইহা অধিক মূল্যবান। হিণ্ড্‌হেডা-র মতে কেবল আলু খাইয়াও প্রোটীনের অভাব মেটানো যায়। আলুতে 'বি' ও 'সি' খাদ্যপ্রাণ আছে এবং আলু খাইয়া স্কার্ভি ও বেরিবেরি সারানো চলে। তবে, আলুতে চূণ-জাতীয় পদার্থ কম। কিন্তু এই অভাব শাক বা দুধ খাইলেই মেটানো যায়। আলুতে সোডা ও পটাশ দুই-ই আছে। ইহারা রক্তকে ক্ষারপ্রবণ রাখিতে সহায়তা করে।

আলুতে যে শ্বেতসার আছে, তাহা সহজপাচ্যও বটে। আলু রান্নার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা উহা সেঁকা বা বাষ্পে সিদ্ধ করা। খোসা ছাড়াইয়া আলু ঠাণ্ডা জলে রাখা কখনোই উচিত নহে, কারণ ইহাতে প্রোটীন ও লবণ নষ্ট হইয়া যায়। যদি সিদ্ধ করিতেই হয়, তাহা হইলে খোসা-সহ করাই উচিত। আলুর খোসা কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে।

পেঁয়াজে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহঘটিত পদার্থ পাওয়া যায়। যাঁহারা রক্তশূন্যতা রোগে ভোগেন, দেখা গিয়াছে যে খাদ্যের সহিত পেঁয়াজ খাইলে তাঁহারা খুব উপকার পান।

করলায় চূণ-জাতীয় পদার্থের অনুপাত কম।

বিলাতী বেগুন, শাক ও বাঁধাকপিতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যপ্রাণ আছে। লেটুস শাক আমাদের দেশে বেশী হয় না, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই আমাদের দেশেও ইহা অতি সহজে উৎপাদন করা সম্ভব। যাহাদের মোটা হইবার ধাত, তাহারা তেল বাদ দিয়া লেবুর রস ও লেটুস খাইতে পারেন।

পটল, মানকচু, কাঁচাকলা সহজপাচ্য এবং রোগীর পথ্য।

কাঁঠালের বীচিতে যথেষ্ট প্রোটীন থাকে বলিয়া বাংলা দেশে ইহার অধিকতর প্রচলন হওয়া উচিত।

(১৭) **ফলমূল**—সাধারণত ফলমূলের পুষ্টিশক্তি তেমন নাই। বাদামে অবশ্য প্রচুর পরিমাণ প্রোটীন ও স্নেহপদার্থ আছে, কিন্তু লবণ-পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের আধার হিসাবেই ইহাদের মূল্য বেশী। ইহারা রক্তের ক্ষারপ্রবণতা রক্ষা করে, স্কার্ভি-রোগ প্রতিরোধ করে এবং কিছু পরিমাণে জোলাপেরও

কাজ করে, যাহার ফলে খাদ্যনালীতে খাদ্যের সহজ চলাচল সম্ভবপর হয়। লেবুর রসের যে স্কার্ভি-রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা বহুদিন হইতেই জানা। আমরা যদি প্রতিদিন, বেশী না হোক, অল্প করিয়াও কিছু ফল খাই, তাহা হইলে অন্ত্রে ব্যাক্‌টিরিয়া-জন্মানো এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। ফল খাইলে যকৃৎ-এর কাজও সুষ্ঠু হয়। জ্বর ইত্যাদি রোগে ফলের রস উপাদেয় ও তেজস্কর পানীয়।

বাদামের প্রোটীনের জৈব-মূল্য খুব এবং ইহাতে স্নেহ-দ্রব্যের পরিমাণও বেশী। তাই নিরামিষাশীদের খাদ্যে বাদামের স্থান হওয়া উচিত। চীনা-বাদামে প্রোটীন ও স্নেহপদার্থ প্রচুর, কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম। চীনাবাদামের তেলে স্নেহপদার্থ কিছু পরিমাণে কমানো সম্ভবপর হইলে বহুমূত্র-রোগীদের পক্ষে উহা বেশ ভালো খাদ্য হইতে পারে।

নারিকেলের শাঁসে আমরা বেশ সস্তায় প্রোটীন, স্নেহ-দ্রব্য ও খাদ্যপ্রাণ পাই। আমাদের দেশে ইহার বেশ প্রচলনও আছে।

শুক্‌নো ফল, যেমন বাদাম, আখরোট, খেজুর, কিসমিস প্রভৃতিতে খাদ্যপ্রাণ কম। টিনে-রক্ষিত ফলে খাদ্যপ্রাণ প্রায় থাকেই না। তবে, টিনে-রক্ষিত আনারসের কথা স্বতন্ত্র।

খাদ্যপ্রাণের দিক দিয়া বিচার করিলে ফলমূলের মধ্যে লেবুর স্থান শীর্ষে। রিকেট-রোগীদের কমলালেবু বা যে-কোনো লেবুর রস খাওয়াইলে উপকার হয়। অন্যান্য ফলের মধ্যে

আম, আঙুর, আপেল, আনারস, পীচ, পেঁপে ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য এবং ইহাদের ব্যবহারও খুব বেশী। এই ফলগুলির দাম অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া গরীব লোকেরা তেমন খাইতে পারেন না।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ফলমূলের শক্তি-উৎপাদন ক্ষমতা কম। কিন্তু কলার বেলায় এই উক্তি খাটে না, কারণ কলার শক্তি-উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট। কলার আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শ্বেতসার ও শর্করা দুই-ই আছে। অন্যান্য ফলের চাইতে ইহাতে প্রোটীনও বেশী। কলার শ্বেতসার খুব সুপাচ্য। কলা হইতে প্রস্তুত ময়দায় (যাহাকে পালো বলে) ৮০% কার্বোহাইড্রেট এবং ৪% প্রোটীন থাকে। ইহা পথ্য রূপেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

(১৮) চা, কফি ও কোকো—খাদ্য হিসাবে চা ও কফির কোনোই দাম নাই। তবে, শরীরকে চাংগা করিবার পক্ষে ইহারা বেশ ভালো পানীয়। চা ও কফির মূল কার্যকরী অংশ হইল কেফিন ও ট্যানিক-অম্ল। কিন্তু শরীর-রক্ষার পক্ষে ইহাদের কোনোই উপযোগিতা নাই। চা ও কফি খুব আরামদায়ক ও সুস্বাদু পানীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অতিরিক্ত পান করিলে বদহজম, অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি দোষ দেখা দেয়। কোকোতে প্রোটীন ও স্নেহদ্রব্য আছে। তাই খাদ্য ও শ্রান্তিনিবারক দুই হিসাবেই কোকো ব্যবহৃত হয়। তবে, সাধারণত যে সামান্য পরিমাণে কোকো খাওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে খাদ্য হিসাবে ইহার

প্রায় কোনোই মূল্য নাই। কোকোর যাহা কিছু খাদ্যমূল্য তাহা উহার আনুষংগিক দুধ ও চিনির জন্য। কোকোর কার্যকরী অংশের নাম থিয়োব্রোমিন। ইহা কেফিন বা ট্যানিক-অম্লের ন্যায় অত উত্তেজক নহে।

(১৯) মদ—মানুষের উপর মদের প্রভাব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া বিস্তারিত আলোচনায় কিছু অসুবিধা আছে। কারণ ইহার সহিত নানারূপ হৃদয়াবেগ, সংস্কার এবং নৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন জড়িত। তাছাড়া পুনঃপুন অল্প পরিমাণে মদ খাওয়ার কি প্রতিক্রিয়া—সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও তেমন পূর্ণাংগ নহে। খাদ্য বলিতে আমরা বুঝি এমন কোনো বস্তু, যাহা খাইলে আমাদের শরীর-গঠনে সাহায্য হয়, বা যাহা শক্তি ও তাপ উৎপাদন করিবার ক্ষমতা রাখে। এখন কথা হইল এই যে, সাধারণত মদ যে পরিমাণে খাওয়া হয়, তাহা কখনোই আমাদের শরীর-যন্ত্রগুলির পক্ষে উপকারী হইতে পারে না এবং দৃশ্যত তাহা শরীর-গঠনেরও কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু মদকে খাদ্যও বলা যায় এই হিসাবে যে, ইহা দগ্ধ হইয়া শক্তি সৃষ্টি করে এবং সেই শক্তি দেহের ব্যবহারে লাগে। মানুষ ও জীবজন্তুর উপর নানা পরীক্ষামূলক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, উপযুক্ত-দেহ-ওজনরক্ষাকারী আহার্যের সহিত সামান্য পরিমাণ কোহল দিলে জন্তুরা দেহের স্নেহপদার্থ সংরক্ষণ করিয়া ওজনে বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ এই নহে যে, কোহল স্নেহদ্রব্যে পরিণত হয়। কারণ এই যে, কোহল দগ্ধ হইবার ফলে

আমরা যে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহদ্রব্য খাই, তাহার সবটা আর দগ্ধ হওয়ার দরকার পড়ে না। কোহল প্রোটীন-রক্ষাকারী হিসাবেও কাজ করে। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, যতটা পরিমাণ কোহল পান করা যায়, তাহার প্রায় ৯০% দেহে ভস্মীভূত হয়। শরীরে ইহার কিছুই জমা হয় না, প্রায় ১-১০ ভাগ শ্বাসপ্রশ্বাস ও মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। পান-করা মদের কিছুটা হয়তো রক্ত ও তন্তুতে কয়েক ঘণ্টার জন্য থাকিতে পারে, কিন্তু সময়ের সংগে সংগে উহা দগ্ধীভূত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যাঁহারা মদ পান করেন, তাঁহারা তাহা খাদ্য হিসাবে পান করেন না—নেশার বস্তু হিসাবেই করেন। শক্তি-উৎপাদনের কার্যে কোহল কখনোই শর্করা হইতে উৎকৃষ্ট নহে, বরং নিকৃষ্ট; কারণ শর্করার ন্যায় ইহা দেহে সংরক্ষিত হয় না। মদের সব চাইতে বড়ো দোষ যে, ইহা অধিক পরিমাণে পান করিলে স্নায়ুতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারে না, বিচারবুদ্ধি লোপ পায়, কথা ভারী হইয়া যায়, সোজাভাবে দাঁড়াইয়া চলাফেরা করা কষ্টকর হইয়া পড়ে,—অর্থাৎ মাতলামির সবগুলি কুলক্ষণই প্রকাশ পাইতে থাকে। অত্যধিক মদ্যপানে যকৃৎ চর্বিতে ভর্তি হইয়া যায় এবং তাহা ঠিকমত কাজ করিতে পারে না। ফলে নানা প্রকার ব্যাধি দেখা দেয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

সারমর্ম—আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, চালে গম অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় এমিনো-অম্ল থাকে

এবং আলুতেও (মিঠে ও সাদা) প্রয়োজনীয় এমিনো-অম্লের ভাগ বেশী। শরীর, মস্তিষ্ক ও দেহতন্তু সংরক্ষণে এই এমিনো-অম্লগুলি সহায়তা করে। হয়তো এই কারণেই পৃথিবীর যে-সকল জাতি আলু বা ভাতের উপর নির্ভরশীল, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি গম বা ভুট্টাজীবীদের চাইতে বেশী। কিন্তু গমে খাদ্যপ্রাণ 'বি' অনেক বেশী। সেইজন্য শুধু চাল খাইয়া সুস্থভাবে জীবনধারণ কঠিন। এই কারণে ভারতবর্ষের সর্বত্রই হয় লাল চাল খাওয়া, অথবা অর্ধেক চাল এবং অর্ধেক গম খাওয়া চালু করিতে হইবে। আজকাল দুধ, মাছ, মাংস, ডিম মহার্ঘ। তাই খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটীন সরবরাহ করিবার জন্য ডাল খাওয়া দরকার। লাল চালের ভাত এবং ডাল ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত হওয়া কর্তব্য। এরূপ খাদ্যের দামও বেশী নহে।

আজকাল বিদেশী পনির খুব সস্তায় পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ক্রয় করিতে অসমর্থ, তাঁহারা দৈনিক ৶১০ পয়সা হইতে ⁄০ আনা পর্যন্ত পনির খাইলে ভালো করিবেন। পনির দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত, এবং ইহাতে ছানা ও মাখন থাকে বলিয়া ইহা দ্বারা জৈব প্রোটীনের অভাব মেটানো সম্ভবপর।

দুধের অভাব আংশিকভাবে শাকের দ্বারা পূরণ করা যাইতে পারে। কারণ দুধে খাদ্যপ্রাণ 'এ' থাকে, শাকেও তাহা বর্তমান। এই খাদ্যপ্রাণটি চোখের অসুখ সারায়। জীবাণুর আক্রমণ হইতেও ইহা দেহকে রক্ষা করে। সুতরাং শাকও প্রত্যহ খাওয়া দরকার। ভারতবর্ষে তরকারির চলন

আরও বেশী হওয়া উচিত। কারণ তরকারি হইতে আমরা দেহ-গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং ক্ষারজাতীয় পদার্থ পাই। বলিতে গেলে, তরকারি হইতে আমরা প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার দ্রব্যই পাইতে পারি।

আজকাল জিনিসের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ লোকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মতভাবে খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিলে দিনে মাত্র ।৶০ আনায় খাওয়া চলিতে পারে। ৫নং তালিকায় এইরূপ আদর্শ খাদ্যের একটি ফর্দ দেওয়া হইল।

* * * *

প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসরব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশে পিষ্ট, জর্জরিত ভারতবাসী আজ আবার স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে চাই প্রচণ্ড শক্তি, পূর্ণ স্বাস্থ্য, অদম্য বীর্য। ইহার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন আপামর দেশবাসীর জন্য সুলভে উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য ও আহার্যের ব্যবস্থা। এই প্রসংগে বিখ্যাত ফরাসী চিন্তানায়ক এ, ব্রিঁলা সাঁভেরা-র (১৭৫৫-১৮২৬) উক্তি স্মরণ করিয়া আমরাও বলিতে পারি:

'Tell me what you eat and I will tell you what you are. The destiny of a people depends on its diet.' ['আপনি আমায় বলুন, আপনি কি খান, আমি আপনাকে বলিয়া দিব, আপনি কি ও কে। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তাহার খাদ্যের উপর।']